bichitra pathshala

LEARNING WITH MOVING IMAGES

জানুয়ারি ২০২১ | বর্ষ ১ | সংখ্যা ২

শিখনের জাদুলাঠি

প্রচ্ছদকাহিনী

শিক্ষায় শিল্পকলা

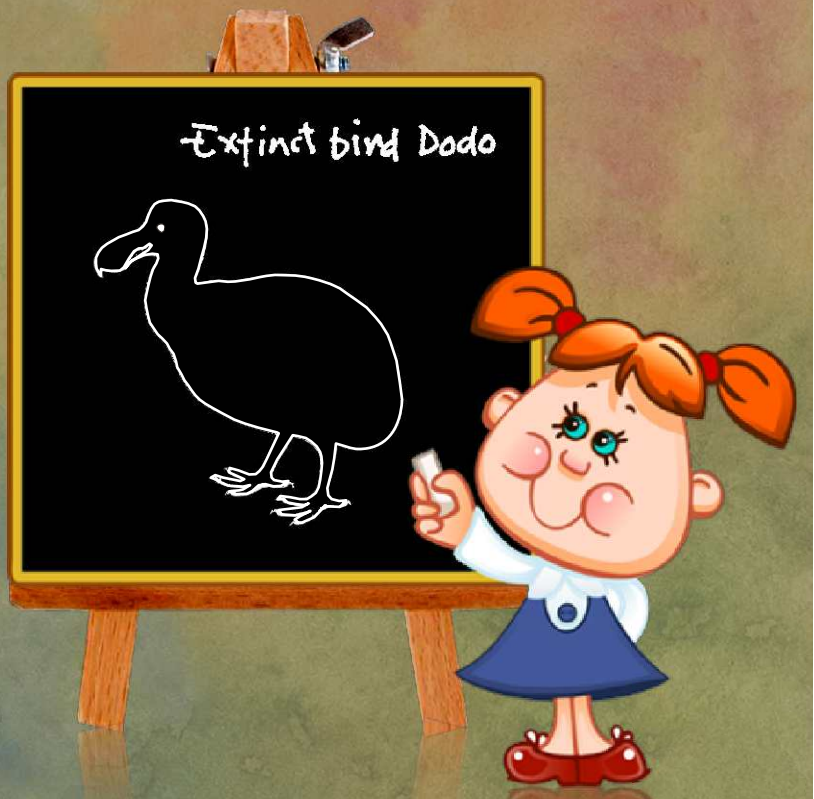

bichitra pathshala

LEARNING WITH MOVING IMAGES

শিখনের জাদুকাঠি

পরিবেশনায়
বিচিত্র পাঠশালা

মুখ্য সম্পাদক
সুমন মজুমদার, ডঃ শ্রীমতী ঘোষ

সহকারী সম্পাদক
শুভা দাশ মল্লিক

প্রচ্ছদ কাহিনী
শিক্ষায় শিল্পকলা

লেখক তালিকা
অনুপমা সেনগুপ্ত, ডঃ সীমা মুখোপাধ্যায়,
শুভা দাশ মল্লিক, ডঃ অলকানন্দা ঘোষ,
সায়ন্তন মুখার্জী, ঋতি মুখোপাধ্যায়, বর্ণালী সেনগুপ্ত

"খোলা খাতা" পৃষ্ঠার অংশীদার
বেলতলা গার্লস স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ
লেখা: আত্রেয়ী দাস, স্মৃতি সাহা
ছবি: কথা চক্রবর্তী, শ্রদ্ধা সাহা রায়, শ্রেয়সী দাস, তনুশ্রী সাঁপুই

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা
অভিজিত দাস

আমাদের ঠিকানা
৯০/১/১ চৌরঙ্গী রোড; কলিকাতা ৭০০ ০২০

WEBSITES
www.bichitrapathshala.org
www.magicofmyschool.org

bichitra pathshala

LEARNING WITH MOVING IMAGES

যা থাকছে

- সম্পাদকীয় ০১
- সম্পাদকের দপ্তরে চিঠি ০২
- শিল্পকলা ও গণিতের অন্তরঙ্গতা ০৩
- শ্যামলী আন্টির ক্লাসে ফিঙ্গার পাপেট ০৬
- একই অঙ্গে দুই রূপ ০৮
- বিজ্ঞান শেখার আনন্দ ১১
- চারুকলা ও শিক্ষার মেলবন্ধন - একটি আলোচনা ১৪
- শিক্ষাক্ষেত্রে সৃজনশীলতার অন্তর্ভুক্তিকরণ - একটি অভিজ্ঞতা ১৭
- এক-একটি রূপকথার জন্ম ১৯
- খোলা খাতা ২১
- বিচিত্র পাঠশালার কর্মকান্ড ২৪

সম্পাদকীয়

সুমন মজুমদার

ডঃ শ্রীমতী ঘোষ

পূর্ববর্তী আত্মপ্রকাশ-সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী "ই-স্কুলে পড়াশুনো" আপনাদের যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। আমরা আনন্দিত ও অভিভূত। আমাদের এ-বারের সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী "শিক্ষায় শিল্পকলা"। আশাকরি এবারেও 'শিখনের জাদুকাঠি' আপনাদের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হবে না।

আজ থেকে পনেরো হাজার বছরেরও আগে যখন ভাষা আকার পায়নি, প্রাচীন প্রস্তর যুগে সম্ভবতঃ নিয়েন্ডারথাল মানুষেরা আলতামিরা গুহায় এঁকেছিল বাইসনের ছবি। গুণমানে তা এতই উচ্চমানের ছিল যে প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল কোনও চিত্রকরের নকল সৃষ্টি। ইঙ্গিতে ভাববিনিময়ের সেই সময়ে মানুষ ব্যবহার করেছিল প্রকৃতির রঙ, গাছের ডালের তুলি আর গুহার দেওয়ালের ক্যানভাস...মানবজাতির অন্যতম বিখ্যাত সে শিল্পকর্ম সম্পর্কে ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

কল্পনা ও বাস্তবের মেলবন্ধনে জন্ম নেয় শিল্প। শিল্পীর কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা, দক্ষতায় জারিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ হয় শিল্পকলা। ছবিআঁকা, ভাস্কর্য, গান, নৃত্য, নাটক, গল্পবলা, চলচ্চিত্র... সবই শিল্পকলার শক্তিশালী মাধ্যম। সত্যজিতের 'আগন্তুক' ছবিতে মামা, মনমোহন মিত্র যেভাবে 'চাকতি চাকতি' মিলিয়ে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ ব্যাখ্যা করেন বা 'গণশত্রু' ছবিতে যেভাবে বিজ্ঞানমনস্কতার গল্প বলা হয়, তা মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে। একইভাবে চিত্রশিল্পে ভিঞ্চির 'ভিট্রুভিয়ান ম্যান' শিক্ষার অগ্রগতির পথে একটি মাইলস্টোন।

আমাদের প্রতিদিনের রোজনামচাতেও নানাভাবে মিশে আছে শিল্পকলা। শিশুর শিক্ষা শুরু হয় মায়ের মুখের গুনগুন সুরে। তারপর অক্ষর দিয়ে তৈরি 'ছড়া' দিয়ে প্রথম পা ফেলা। রবীন্দ্রনাথের 'সহজপাঠ' তো ছবি আর ছন্দের অপূর্ব সমন্বয়। অবসরযাপনের মধ্যেও আছে শিল্পকলা। লুডোর বোর্ডে সাপ-মই ছকে গুণনের আর 'বিজনেস গেম'-এও যেন অঙ্ক আর ভূগোলের ছায়া। পরমাণুর গঠন বোঝাতে, ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রনের জটিল সম্পর্ক বোঝাতে, এমনকি নিরক্ষর গাড়িচালককে পথসঙ্কেত বোঝাতেও সেই চিত্রেরই হাত ধরতে হয়। পাতালরেলের স্টেশনের দেওয়ালই হোক, কি মন্দির-মসজিদ-গির্জার দেওয়াল...সর্বত্রই চিত্রের মাধ্যমে জনসংযোগ, জনশিক্ষা নানাভাবে দেখা যায়। যেখানে প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতি থমকে দাঁড়ায়, শিল্পকলার পিঠে সওয়ারি হয়ে তার অগ্রগতি হয় আরও অনেক দূর। জনসংযোগের সহজ এই মাধ্যম আরও বেশি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এর সহজ উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন। প্রথাগত শিখনপদ্ধতির পাশাপাশি শিল্পকলার কি চমৎকার মেলবন্ধন করা হয়েছে সেখানে।

আমাদের এই সংখ্যায় নানা আঙ্গিকে দেখার চেষ্টা করেছি বিষয়টিকে। শিক্ষার বাহক হিসাবে শিল্পকলার আরও কার্যকরী প্রয়োগ হোক এই আশা রাখি।

সম্পাদকের দপ্তরে চিঠি

সম্পাদক সমীপেষু

সুন্দর পরিবেশন

'শিখনের জাদুকাঠি'র সম্পাদকত্রৈয়ীকে অভিনন্দন। প্রথম সংখ্যাটি খুব সুন্দর হয়েছে। পরিবেশন এত সুন্দর হলে বেশি করে পড়ার ইচ্ছে জাগে। প্রচ্ছদ কাহিনী, বলা বাহুল্য - সময়োপযোগী।

ই-ম্যাগটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, কলকাতা

নির্মম সত্যের মুখোমুখি

'শিখনের জাদুকাঠি' বিচিত্র পাঠশালার একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় প্রয়াস। 'লকডাউনের ব্ল্যাকবোর্ড' এবং 'নব্য স্বাভাবিকতা - সমস্যা ও সম্ভাবনা' লেখাদুটি পড়ে একটি নির্মম সত্যের মুখোমুখি হলাম। এতদিন ভাবতাম corona is the great leveller. কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে corona is a great divider ..। প্রযুক্তি যাদের নাগালের বাইরে, তাদের ভবিষ্যৎ ভীষণভাবে অনিশ্চিত এবং অন্ধকার। আশা করি নতুন বছরে এই সব ছাত্রছাত্রীদের জীবনে নতুন আলো ফুটবে।

ডঃ সুমনা দত্ত, দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, নয়া দিল্লী

বৈচিত্র্য প্রয়োজন

'শিখনের জাদুকাঠি'র সমস্ত লেখা পড়লাম। সন্দেহ নেই এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

এককভাবে দেখলে প্রতিটি লেখাই সুখপাঠ্য। অভিজ্ঞতার বর্ণনা আর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখাগুলি উৎসাহব্যঞ্জক। নব্যস্বাভাবিকতাকে মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতা শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতিকে উন্নত করার আশা জাগিয়েছে। তবে পত্রিকাটি পাঠের বৈচিত্র্য আনার জন্য প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন বিষয়ের পঠন পাঠনের আলোচনার। বিজ্ঞানপাঠের ব্যাপারে যে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে সেই গুরুত্ব ভাষাশিক্ষা বা সমাজবিজ্ঞান শিক্ষায় আসে নি। সাধারণভাবে সমাজবিজ্ঞান ও ভাষাশিক্ষা স্কুল শিক্ষার্থীদের এবং অভিভাবকদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে উঠেছে। অথচ অডিও ভিস্যুয়াল পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা খুবই আকর্ষণীয় করে তোলা যায় ।

অনলাইন ক্লাস নিতে গিয়ে পড়ুয়াদের দুষ্টুমির মুখোমুখি হওয়ার গল্প খুব সরস। খুদে পড়ুয়ারা যে কত বিবিধ উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী আর সেই সঙ্গে প্রযুক্তি চটজলদি প্রয়োগের উৎসাহ বড়দের বিপাকে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট।

'চিত্তে চলচ্চিত্র' লেখাটিতে লেখিকার সক্রিয় একাগ্রতা মুগ্ধ করেছে।

'হাতে কলমে' বিজ্ঞানের ভিডিওগুলি বেশ কার্যকরী,বহু পড়ুয়া বাড়িতে বসে হাতের কাছে পাওয়া বস্তুসামগ্রী সংগ্রহ করে পরীক্ষা করতে উৎসাহিত হবে। লেখিকার এই কাজে ধীরে ধীরে পারদর্শিতা অর্জনের বিবরণ আকর্ষণীয়।

'নব্য স্বাভাবিকতা - সমস্যা ও সম্ভাবনা' লেখাটিতে অনলাইন শিক্ষা ও শিক্ষণের যে সম্ভাবনার আভাস পাওয়া গেল তাতে অবশ্যই আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হয়।

মিতা চৌধুরী, কলকাতা।
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, আসানসোল গার্লস কলেজ

শিল্পকলা ও গণিতের অন্তরঙ্গতা

- অনুপমা সেনগুপ্ত

শিল্পকলা, তা সে ভিস্যুয়াল বা পারফর্মিং, যে কোনও রকমেরই হোক না কেন, তার বৈশিষ্ট্য হল যে তা আমাদেরই আবেগ, অনুভূতি, সৃজনশীলতা এবং নান্দনিকতার প্রকাশমাধ্যম। আর শিল্পীর কাজ সেই ভাবাবেগকে দক্ষতার সাথে পরিবেশন করা, তাই শিল্পকলা ও শিল্পী উভয়ের অস্তিত্বই আমাদের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভাবতে অবাক লাগে যে আমাদের অজান্তেই এক মহান শিল্পী তাঁর অসংখ্য শিল্প নিদর্শন দিয়ে কেমন অকাতরে আমাদের ঘিরে রেখেছেন আর আমরাও নির্দ্বিধায় তাকে উপভোগ করে চলেছি এক জন্মগত অধিকারবোধ নিয়ে। কিন্তু সচেতনতার সাথে কতজন আমরা অনুভব করি সে সত্য? কতজনই বা জানতে চাই সেই শিল্পীর কি পরিচয়, বা কি তাঁর শিল্প মাধ্যম? সেই শিল্পী আর কেউ নন,

ফিবোনাচি ধারা

ফ্র্যাকটাল

তিনি হলেন স্বয়ং প্রকৃতি আর তাঁর শিল্পমাধ্যম হল বিজ্ঞানরসে সিক্ত। মজার কথা হল এই বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ শিল্পভাণ্ডারকে সচেতনতার সঙ্গে আস্বাদন ও বিশেষণ করতে গিয়ে কিছু রসিক ও বোদ্ধা মানুষজনকে বারবার দ্বারস্থ হতে হয়েছে গণিতের। প্রকৃতিকে জানতে বুঝতে আমাদের হাতিয়ার বিজ্ঞান, আর বিজ্ঞান

স্থাপত্যে ষড়ভুজ

ষড়ভুজ তৈরির প্রাকৃতিক কারিগর মৌমাছি

কথা বলে গণিতের ভাষায়। শিল্পকলার বিবিধ মাধ্যমে অঙ্কের ব্যবহারিক প্রয়োগ কিংবা পৃথিবীর বিভিন্ন সৃষ্টিশীল মানুষের শিল্পকর্মে গণিতের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস আমাদের আশ্চর্য করে ও চিন্তাধারাকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে। স্থাপত্য, চিত্রকলা, নৃত্য-সঙ্গীত, সূচিশিল্প, কারুশিল্প, অরিগামি, খেলাধুলা, সর্বক্ষেত্রে গণিতের প্রচ্ছন্ন ভূমিকা আজ সর্বজনবিদিত। পিথাগোরাস থেকে মোজার্ট, ইসার থেকে ভিঞ্চি, পিকাসো এমনকি লেখক, কবি, ভাস্কর সবাই এই গণিতের অনিন্দ্যসুন্দর ভাবনায় আলোড়িত আন্দোলিত হয়েছেন। তাই 'সোনালি অনুপাত', 'ফিবোনাচি ধারা' আজ আর কারো কাছে অচেনা শব্দ নয়। এর ফলে আমরা আজ 'কোটি টাকা'র প্রশ্নের মুখোমুখি, তা হল "শিল্পে যদি গণিত থাকে তাহলে গণিতশিক্ষায় শিল্পের ব্যবহার নয় কেন?" সাধারণ পড়ুয়াদের মধ্যে গণিত বা অঙ্কের ভীতি কাটাতে শিল্পকে কাজে লাগানো বা তার শিল্পীসত্ত্বাকে জাগিয়ে তোলার সব রকম প্রচেষ্টাই কি আমাদের করা উচিত নয়? তবে আশার কথা যে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতিতে (NEP ২০২০) প্রতিফলিত হতে দেখছি এবং যার সুফল পেতে আমরা সকলেই প্রত্যাশী। এই প্রসঙ্গে আমার এক অভিজ্ঞতার কথা বলছি। সময়টা ছিল ৩০শে মার্চ, ২০১৭, দক্ষিণ ২৪ পরগণার এক গ্রামের স্কুলে গিয়েছিলাম অঙ্কের কর্মশালাতে। সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের কাছে হাতেকলমে গণিত বিষয়টির ওপর কাজের অভিজ্ঞতা সেই প্রথম। তাই যখন তাদের বলি "কে কে কাগজের নৌকা বানাতে পারো, হাত তোল"। তখন প্রথমে তারা একটু অবাক হয়ে যায়। 'অঙ্কের ক্লাসে এমন প্রশ্ন কেন..' এই বিস্ময় সকলের চোখে মুখে স্পষ্ট ফুটে ওঠে কিন্তু সকলেই হাত তোলে। তারপর তাদেরকে গ্রুপে ভাগ করে কাগজ দেওয়া হলে তারা নৌকা বানায় ও আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করে থাকে পরবর্তী নির্দেশের জন্য। পরের ধাপে নৌকার সব ভাঁজ খুলে ভাঁজ বরাবর দাগ কেটে কোন কোন জ্যামিতিক আকারের দেখা পাওয়া যায় তার তালিকা তৈরির কাজে তারা লেগে পড়ে। এরপর আগে থেকে কেটে রাখা কয়েকটি বর্গাকার ও ত্রিভুজাকার টুকরো তাদের দেওয়া হয় ও সেগুলি সন্নিবিষ্ট করে তাদের মনের মত সাজাতে বলি। খেলার ছলে তাদের আঙ্কিক উপলব্ধির বিকাশ ঘটে। এ ব্যাপারে ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত উপরোক্ত চিত্রটি একটি আদর্শ চিত্র। যাই হোক, অষ্টম

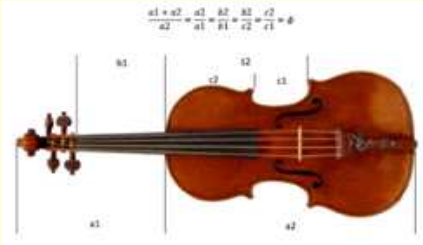

থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মিশ্রগ্রুপের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কাগজ কেটে এবং ভাঁজ করে বিভিন্ন সূত্র ও জ্যামিতির উপপাদ্য প্রমাণ করার পর তাদের আনন্দ ও উৎসাহ ছিল দেখার মত। বর্গাকার কাগজ থেকে 'সেইল বোট' বানানোর পর সব ভাঁজ খুলে ফেললে দাগ বরাবর ফুটে ওঠে বীজগাণিতিক সুত্র -- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ এর চাক্ষুষ প্রমাণ।

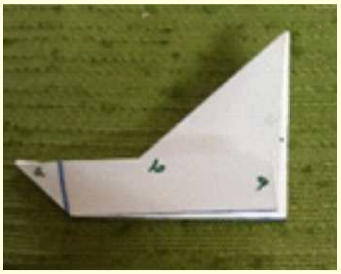

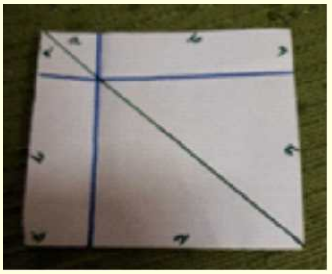

এরপর 'বিজ্ঞান প্রসার' প্রকাশিত Origami - Fun and Mathematics বইএর অনুসরণে tea coaster তৈরি করার পর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাকে রঙ দিয়ে ভরিয়ে এক অনন্য সাধারণ রূপ দেয় তারা।

'Coaster' তৈরির প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ গাণিতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে করা, যেখানে তারা শিখতে পেরেছিল অঙ্ক, একক ক্ষেত্রফল

বিশিষ্ট ত্রিভুজের সাহায্যে কি করে একটি বর্গাকার কাগজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা যায় সেই পদ্ধতি। যা তাদের অন্তরে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল শিল্প বা আর্টের ভাবনা। তাই তাদের বক্তব্য ছিল শুধু কোস্টার নয় এমনি করে গণিত প্রয়োগ করে, তারা কার্ড, 'wall hanging' বা চাঁদমালা তৈরি করবে। আমি বাকরুদ্ধ হয়ে যাই তাদের বক্তব্য শুনে ও সৃজনশীলতার পরিচয় পেয়ে। এইখানেই শেষ নয়, এরপর তারা জানতে চায় সেইসব শিল্পকর্মের কথা যেখানে গণিতের প্রক্রিয়া কেবল 'অঙ্ক কষা' বা 'অঙ্ক করা' র মধ্যে

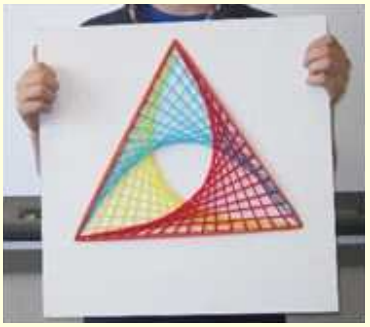

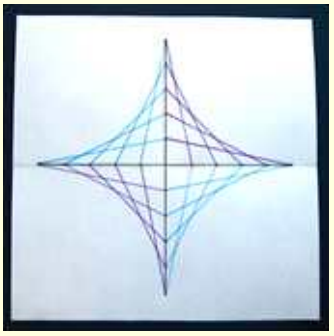

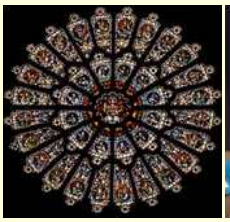

সীমাবদ্ধ না থেকে দৃষ্টিনন্দন ও অনুভবের বিষয় হয়ে গেছে। সরলরেখার সাহায্যে বক্ররেখার খোঁজ অথবা প্রতিসাম্য অক্ষরেখা ও ঘূর্ণন প্রতিসাম্যকে হাতের নাগালে পাওয়ার ফলে গণিতভীতি থেকে তাদের মিলেছে মুক্তি, মিলেছে আনন্দের সন্ধান। সেই আনন্দের আর এক নাম 'সোনালি অনুপাত'। মানবদেহে, স্থাপত্যে, শিল্পে সর্বত্র এর দেখা মেলে স্বমহিমায়।

তাই আর্টের অন্তর্নিহিত গণিত নাকি গণিতের অন্তরের নিপুণ শিল্পসত্ত্বা, যে ভাবেই তাকে দেখি না কেন, বিদ্যালয়শিক্ষার পাঠক্রমে তার অন্তর্ভুক্তি শিক্ষক-ছাত্র নির্বিশেষে সবাইকে সমৃদ্ধ করবে সন্দেহ নেই। যেমন গণ্ডারের ছবিটিতে দ্বিমাত্রিক

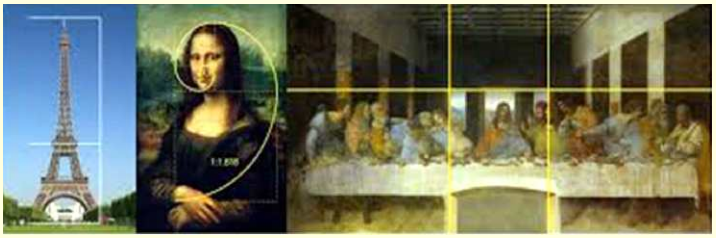

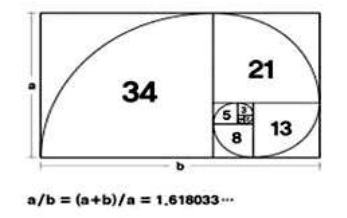

সোনালি অনুপাত

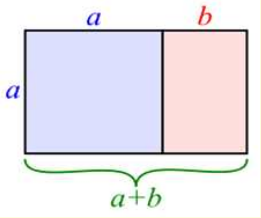

ত্রিভুজগুলির বিন্যাস কৌশলের মাধ্যমে গণিতের জ্ঞান দৃঢ় হওয়া এবং রঙের ছোঁয়ায় সেই বিন্যাসকে ত্রিমাত্রিক রূপে জীবন্ত করে তোলার দৃষ্টান্তটি অতুলনীয় ।

তাই আপাতদৃষ্টিতে গণিত ও শিল্পকে দুই ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা মনে হলেও তাদের অন্তরঙ্গতা আমাদের অনুমানের থেকেও গভীর। আর সবচেয়ে বড় কথা হল যে এই মেলবন্ধন, ক্লাসের পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের জীবনে এগিয়ে যেতে সাহায্য ক'রে তাদের যে এক অন্য মাত্রা প্রদান করবে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই ।

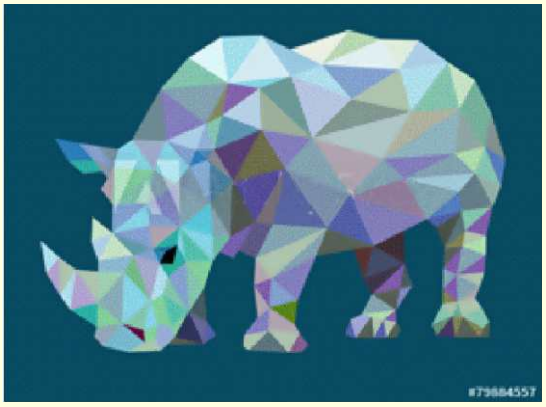

সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর শিক্ষকতা করার পর শ্রীমতি অনুপমা সেনগুপ্ত ২০১০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর নিলেও হাতেকলমে গণিতশিক্ষার বিষয়ে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। বর্তমানে তিনি সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরাম, জেবিএনএসটিএস, সেন্টার ফর ইন্টারডিসিপ্লিনারি রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন এবং বিচিত্র পাঠশালার মত বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন। গণিত এবং পরিবেশ সচেতনতার ওপর কর্মশালা পরিচালনার অভিজ্ঞতা তাঁকে অনেকের থেকে স্বতন্ত্র করে।

ঋণস্বীকার

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fblog.dubspot.com%2Ffibonacci-sequence-in-music%2F&psig=AOvVaw1M_JHB6OzR1TZQryEm0wVM&ust=1608164313841000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwijyM2GndHtAhUu6jgGHXCCAX8Qr4kDegUIARDdAQ

http//www.vigyanprasar.gov.in

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AND9GcQMpOLRueDbXq1UmkLFk0eTZYf4u7PUTQ7-Nw&usqp=CAU

https://fibonacci.com/wp-content/uploads/2019/01/Doryphoros.png

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AND9GcTNtaBAHyJJpFV8deYUl10V5EvhYw-wZ9Obsw&usqp=CAU

https://thumbs.worthpoint.com/zoom/images1/1/0719/27/picasso-triangle-siamese-cat-aceo_1_ea5655cb5a42a053dfbe439452ec2f3d.jpg

https://as2.ftcdn.net/jpg/00/79/88/45/500_F_79884557_VdgvGuyjQspYXm6OuxzzvRLLfOKjCtuY.jpg

শ্যামলী আন্টির ক্লাসে ফিঙ্গার পাপেট

- ডঃ সীমা মুখোপাধ্যায়

পুতুলনাচ (পাপেট) বললেই মনটা কেমন চনমন করে ওঠে। ছোটদের মন জয় করতে পাপেটের জুড়ি মেলা ভার। শুধু ছোটরা কেন পাপেট যখন নড়াচড়া করে বা কথা বলে, বড়রাও মন দিয়ে শোনে।

আগে গ্রামের মেলায় তাঁবু ফেলে পুতুলনাচ হত। এখনও কোথাও কোথাও হয়। শহরে অনেক জায়গায় মাঝে মাঝে টিকিট কেটে পাপেট শো আয়োজন করা হয়। সুযোগ পেলেই ছোটরা হাসি হাসি মুখ করে বড়দের হাত ধরে শো দেখতে হাজির হয়। অনেকে আবার টিভি বা ইউটিউবে রকমারি পাপেট শো দেখে থাকে।

শ্যামলী আন্টি অনেক সময় ক্লাস শুরুর আগে পাপেট দেখিয়ে ক্লাস নেন। পড়ুয়ারা অবাক বিস্ময়ে পুতুল দেখতে দেখতে শ্যামলী আন্টির ক্লাস করে। সেদিন আন্টি জৈবচাষ সম্পর্কে ক্লাস নিলেন। তার আগে আন্টির ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়ল দশটা খুদে খুদে পাপেট। আন্টি পটাপট পাপেটগুলো দশটা আঙ্গুলে পরে ফেললেন। এবার অভিনয় করে ছোট্ট একটা গল্প বললেন। গল্পের নাম - পিঁপড়ে আর শুঁয়োপোকা।

[শুঁয়োপোকা চিঁ চিঁ করে কেঁদে চলেছে...]
পিঁপড়ে - আরে কান্নার আওয়াজ পাচ্ছি যেন... একি !
শুঁয়োপোকা তুমি কাঁদছো কেন?

শুঁয়োপোকা - আমার খুব খিদে পেয়েছে। খিদের জ্বালায় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

পিঁপড়ে - ওমা! সে কি কথা! আরে তুমি যে ডালে বসে আছো সেখানেই তো কত কচি কচি পাতা রয়েছে। তুমি পাতাগুলো কুচকুচ করে কেটে খেয়ে নিলেই তো পেট ভরে যাবে।

শুঁয়োপোকা - ধুস! পাতাগুলো খেয়ে দেখেছি। এমন বিস্বাদ যে মুখে দেওয়া যায় না। এই গাছে মনে হয় পোকা-মারা বিষ দেওয়া হয়, তাই এমন বিচ্ছিরি খেতে। রক্ষে করো, এসব পাতা চিবোলে আমি হয়ত মরেই যাবো..।

পিঁপড়ে - ও তাই এমন কান্নাকাটি জুড়েছো। আচ্ছা, দাঁড়াও দাঁড়াও.... আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।

শুঁয়োপোকা - কি বুদ্ধি ভাই?

পিঁপড়ে - আমি তোমার দিকে একটা শুকনো ডাল এগিয়ে দিচ্ছি। তুমি আস্তে আস্তে ওই ডাল বেয়ে আমাদের দিকে চলে এসো। এখানকার গাছপালায় কোনও রাসায়নিক সার বা কীটনাশক দেওয়া হয় না।

শুঁয়োপোকা - ওমা, তাই বুঝি..!

পিঁপড়ে - হ্যাঁ। এখানে গাছপালাদের যে স্যারেরা দেখাশুনা করেন তারা ওদের ছাত্রদের শেখান কি করে জৈবকৃষি বা অর্গানিক ফার্মিং পদ্ধতিতে গাছেদের বড় করতে হয়।

শুঁয়োপোকা - ওহ, তাহলে তোমাদের ওখানকার গাছের পাতা খেতে নিশ্চয়ই খুব সুস্বাদু?

পিঁপড়ে - আগে এসে খেয়েই দেখ। তাহলেই তফাতটা বুঝতে পারবে।

[শুঁয়োপোকা ধীরে ধীরে শুকনো ডাল বেয়ে পিঁপড়ের কাছে পৌঁছে গেল। তারপর কচমচ করে পাতা খেতে লাগলো।]

শুঁয়োপোকা - ওহ, এতক্ষণে ভালো স্বাদের পাতা খেয়ে

খিদের জ্বালা একটু মিটলো। তোমায় যে কি ভাষায় ধন্যবাদ জানাবো পিঁপড়ে ভাই...

পিঁপড়ে - না, না ধন্যবাদ দিতে হবে না। কেউ বিপদে পড়লে, তাকে সাহায্য করাটাই তো কর্তব্য।

শুঁয়োপোকা - ভাই, পিঁপড়ে, তোমাকে কিন্তু আমার একটা কথা রাখতে হবে।

পিঁপড়ে - কি কথা বলেই ফেলো।

শুঁয়োপোকা - তুমি তো জান আমার খাওয়া শেষ হলে লালা দিয়ে গুটি তৈরি করে সেখানে কিছুদিন থাকবো। তারপর প্রজাপতি হয়ে বেরোবো গুটি কেটে।

পিঁপড়ে - হ্যাঁ, সে কথা তো সবাই জানে।

শুঁয়োপোকা - আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে প্রজাপতি হয়ে গুটি কেটে বেরোনোর পর তোমাকে পিঠে চাপিয়ে এধার ওধার ঘুরতে বের হবো।

পিঁপড়ে - বাঃ, এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ ভাবি প্রজাপতি।

পড়ুয়ারা রুদ্ধশ্বাসে পিঁপড়ে আর শুঁয়োপোকার গল্প উপভোগ করলো। এবারে শ্যামলী আন্টি অর্গানিক ফার্মিং সম্পর্কে তাঁর ক্লাসটা নিলেন। পড়ুয়ারা মন দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনলো এবং নানা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সেদিনের ক্লাস শেষ হল। তার মধ্যে দুই-একজন পড়ুয়া জানতে চেয়েছিল, কি করে ওই আঙ্গুলে পরা পাপেটগুলো বানাতে হয়। শ্যামলী আন্টি বুঝিয়ে দিলেন কি করে সহজে ফিঙ্গার পাপেট বানাতে হয়।

শুধু বিজ্ঞান নয়, ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য অঙ্ক.. যেকোনও বিষয়ই পড়ুয়াদের কাছে সহজে ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরতে ফিঙ্গার পাপেটের জুড়ি নেই। খুব সহজে এগুলো বানানোও যায়। প্রয়োজনে ইন্টারনেটেরও সাহায্য নেওয়া যায়।

অনলাইন পঠনপাঠনের সময়ে ক্যামেরার সামনে পাপেট ধরে সহজেই সকল পড়ুয়ার কাছে পৌঁছানো যায়। পাপেটের নতুনত্ব আর গল্পের জাদু, দুয়ের মিশেলে এই পদ্ধতি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে।

ডঃ সীমা মুখোপাধ্যায়
দীর্ঘদিন উন্নয়নমূলক যোগাযোগ কর্মকান্ডে যুক্ত। সম্পাদক, সোসাইটি ফর অডিও ভিস্যুয়াল স্টাডি অফ লাইফ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট

ফিঙ্গার পাপেট তৈরির কায়দা

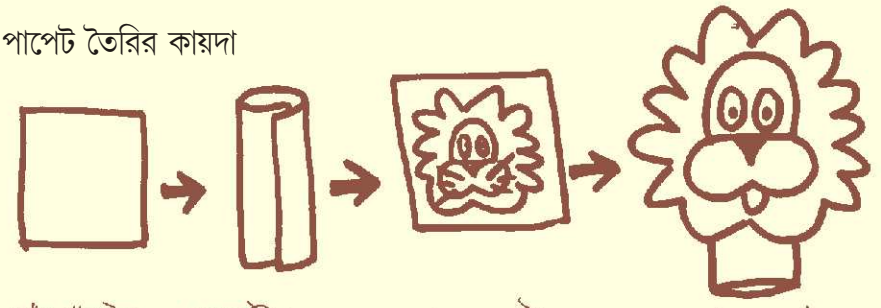

কয়েকটি ফিঙ্গার পাপেট

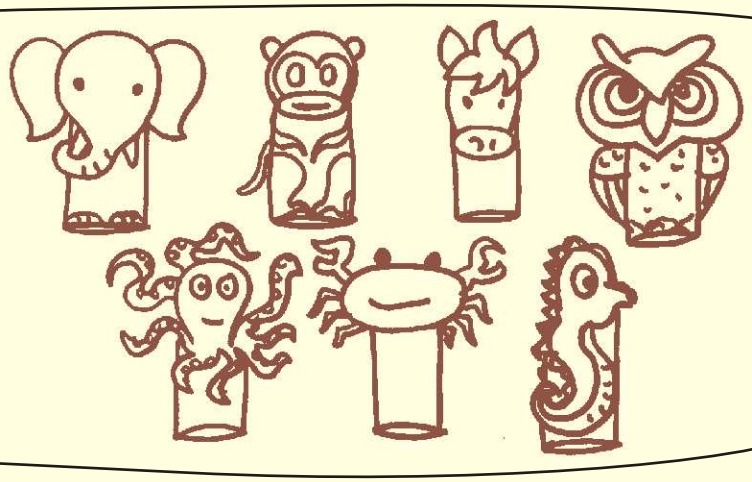

একই অঙ্গে দুই রূপ

- শুভা দাশ মল্লিক

আনুমানিক বারো তেরো বছর আগের কথা। বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে একটা মজার কর্মশালা হয়েছিল। দশজন তরুণ শিল্পী মিলে জনা পঞ্চাশ কচিকাঁচাকে নিয়ে পাঁচদিন ধরে নানারকম খেলায় মেতেছিল। কেউ কয়লাখনির প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে কৃষ্ণগহ্বরের অনুসন্ধান করেছিল। পরনে তাদের ছিল প্যাকিং-বাক্স দিয়ে তৈরী পোশাক আর মাথায় ছিল শোলার টুপি। টুপির মুখে ছিল

কৃষ্ণগহ্বর যাত্রী

একটি করে আলো, গহ্বরের পথ আলোকিত করার উদ্দেশ্যে। কেউ আবার গাড়ি বারান্দার থামকে রকেটে পরিণত করে ভগবানের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলো। তাদের প্রজেক্টের নাম ছিল FOG অর্থাৎ কিনা Finding Out God. এই দলেরও পরনে ছিল মহাকাশযাত্রীর পোশাক - সবই অবশ্য পরিত্যক্ত বস্তু দিয়ে তৈরী।

আর একটি দল তৈরী করল সাইকেলচালিত টিভি। সাইকেলের চাকা ঘুরবে আর টিভির পর্দায় ছবি পাল্টাবে। শব্দপ্রেমী একটি দল

সাইকেল চালিত টিভি

বেলুন আর পাইপ দিয়ে এমন একটি বাদ্যযন্ত্র তৈরী করল, যার শব্দে কান ঝালাপালা। 'আওয়াজখানা দিচ্ছে হানা দিল্লী থেকে বর্মা'। এইভাবে পাঁচদিন ধরে বি আই টি এম এর প্রাঙ্গণ, বাগান আর হলঘর জুড়ে চলেছিল কাগজ, কাঁচি, আঠা, দড়ি, রং, তুলি আর ফেলে দেওয়া এটা সেটা নিয়ে তুমুল কান্ড। তত্ত্বাবধানে ছিলেন স্বর্গীয় অভিজিৎ গুপ্ত, ছত্রপতি দত্ত, সঞ্চয়ন ঘোষ প্রমুখ নামী শিল্পী। আর এই কর্মকান্ডের সাক্ষ্য দিয়েছিল হোমি ভাবা, জগদীশ বসু, সি ভি রমন প্রমুখ বিজ্ঞানীর মূর্তি।

পাঠক ইউটিউবের এই লিঙ্কটির সাহায্যে উপরোক্ত কর্মশালার একটি ঝলক দেখতে পারেন: https://youtu.be/exVgs8CtBYk

প্রশ্ন হলো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পীঠস্থানে এই ধরণের একটি 'আর্ট এন্ড ক্রাফট' মার্কা কর্মশালা কেন? এর উত্তর আমরা সহজেই পেয়ে যাবো যদি শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'খেরোর খাতা'য় একবার উঁকি মারি। ইতালীয় রেনেসাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী, 'মোনালিসা' এবং 'লাস্ট সাপার'এর স্রষ্টার খাতা দেখলে যেন মনে হবে কোনো বিজ্ঞানীর ডায়েরি। এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যেমন নানারকম যন্ত্রের নিপুণ ড্রয়িং আছে, তেমন আছে মানুষের খুলির অঙ্কন, বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের ত্রিমাত্রিক অঙ্কন এবং আলোর গতিপথের জ্যামিতিক নকশা। তিনি বোঝার চেষ্টা করেছেন ক্যানভাসের তেলরং থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে পোর্ট্রেটের দ্যুতি কতটা বৃদ্ধি করবে। তিনি যেমন পরিচিত অপরিচিতদের মুখের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কলমের ডগায়, সেই একই কলম দিয়ে তিনি অপর পৃষ্ঠায় কাল্পনিক উড়োজাহাজের স্কেচ করেছেন। 'ভিট্রুভিয়ান ম্যান'এর অবয়বে তিনি 'গোল্ডেন রেশিও' বা সোনালি অনুপাতের সন্ধান করেছেন। যে জিজ্ঞাসা নিয়ে তিনি মানবদেহের মধ্যে সৌন্দর্যের সন্ধান করেছিলেন, সেই একই জিজ্ঞাসা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন কাঠঠোকরার জিভ দেখতে কেমন হয়। সমরেন্দ্রনাথ সেন "বিজ্ঞানের ইতিহাস" পুস্তকে (শৈব্যা প্রকাশনী,

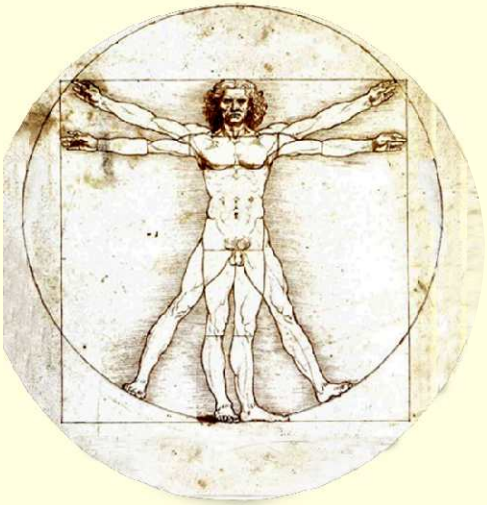

লিওনার্দোর ভিট্রুভিয়ান ম্যান

১৯৯৫) লিওনার্দো দা ভিঞ্চির উপর একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, "সাহিত্যে পেত্রার্কের উদাত্ত কণ্ঠ যদি নবীনযুগের সূচনা করিয়া থাকে, বিজ্ঞানে সেই নবযুগকে চিহ্নিত করিয়াছেন ফ্লোরেন্টাইন লেওনার্দো দা ভিঞ্চি। বলিতে গেলে আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়াপত্তনে তিনি একাই একটি সমগ্র অধ্যায়"।

লিওনার্দোর জীবনীকার ওয়াল্টার আইজ্যাকসন লিখেছেন, "Leonardo knew how to marry observation and imagination. which made him history's consummate innovator."

দা ভিঞ্চির 'খেরোর খাতা' প্রমাণ করে যে বিজ্ঞানচর্চা এবং শিল্পচর্চাকে আপাতদৃষ্টিতে যতটা পরস্পরবিরোধী মনে হয়, সেরকমটা কিন্তু নয়। আমরা বলি বিজ্ঞান যুক্তিনির্ভর আর শিল্প কল্পনানির্ভর। কিন্তু কল্পনা ছাড়া কি বিজ্ঞানের প্রগতি সম্ভব? প্রখর কল্পনা শক্তি না থাকলে কি আইনস্টাইন প্রশ্ন করতে পারতেন, "আমি যদি আলোর রশ্মিতে চড়ে যাত্রা করি, তবে আমার কি অবস্থা হবে?"

এখন প্রশ্ন হলো, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা কি বিজ্ঞানচর্চার ভিতর দিয়ে কল্পনার বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার মতন জমি তৈরী করেছি? ছাত্র যখন জলের বাষ্পীভবন পড়ে, সে কি কল্পনা করতে পারে, কি প্রক্রিয়াতে একটি একটি করে অণু জলের পৃষ্ঠতল থেকে মুক্তি পায়? কিংবা সে যখন অঙ্ক কষে বার করে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মিলনে কতটা তেজ নিঃসরণ হয়, তখন কি সে কল্পনা করতে পারে এই তেজের পরিমাপ? কোনও ভালো শিক্ষক হয়তো তাঁর বাচনপটুত্বে ছাত্রের কল্পনাশক্তি উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, যেমন করতেন রিচার্ড ফাইনম্যান। আবার কোনো শিক্ষক হয়তো বোর্ডে ছবি এঁকে ছাত্রের কল্পনার নেত্র খুলে দিতে পারেন। যা চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, তাকে তো কল্পনার মধ্যেই অনুভব করতে হবে।

বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ই পঞ্চেন্দ্রিয় বহির্ভূত। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জাগ্রত না হলে বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানশিক্ষা ব্যবস্থায় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জাগ্রত করার কোনও আয়োজনই নেই। সেই কারণেই শিল্পের শরণাপন্ন হওয়া। সেই কারণেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মিউজিয়ামে শিল্পীদের নিয়ে কর্মশালা। এই কর্মশালায় ক্ষুদে স্রষ্টারা বিদঘুটে বাদ্যযন্ত্র সৃষ্টির নেশায় শব্দের বেশ কিছু পাঠ শিখে নিল, যা তাদের পাঠ্য পুস্তকে হয়তো নীরসভাবে উপস্থাপিত আছে। যারা সাইকেল-টিভি নির্মাণ করল, তারা সাধারণ যন্ত্রসমূহের (simple machines) সবকটি সূত্রই হয়তো শিখে নিলো। একদল ছেলে মেয়ে ধুনুচির আগুনের উপর রংবেরঙের কাগজের প্যাঁচ ঝুলিয়ে পর্দা তৈরী করেছিল। উর্ধমুখী উত্তপ্ত বায়ুর চাপে ঘুরন্ত প্যাঁচগুলি এক মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি করেছিল। বিজ্ঞান ও শিল্পের মেলবন্ধনের এক আদর্শ নিদর্শন।

পরিচলন প্রবাহ চালিত সাতরঙা পর্দা

এই কর্মশালার বিশেষত্ব এই ছিল যে এখানে কোনও 'লার্নিং অবজেক্টিভ' বা 'এক্সপেক্টেড লার্নিং আউটকাম' মাথায় রেখে কাজ শুরু হয় নি। পাঁচ দিনের শেষে কি বেরোবে কারোর ধারণা ছিল না। ছেলে মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রথম দিন একটি চলচ্চিত্র দেখানো হয়েছিল, যার নাম "How things work"। এই চলচ্চিত্রে দেখা গেল কার্য-কারণ সমন্বয়ের এক অদ্ভুত শৃঙ্খলা। একটি চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে একটি পেন্ডুলামকে ধাক্কা মারছে। পেন্ডুলামটি দোল খেয়ে এসে একটি সুইচ টিপে দিচ্ছে। সুইচ একটি বৈদ্যুতিক সার্কিটকে জাগিয়ে তুলছে, যার ফলে একটি চুম্বক আকৃষ্ট হচ্ছে। এই ভাবে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত একটি বাদ্যযন্ত্র থেকে সুমধুর সঙ্গীত নির্গত হয় এবং সেখানেই খেলা শেষ হয়। এই ছবি দেখার পরে নবীন শিল্পীদের সঙ্গে কচিকাঁচাদের আড্ডার আসর বসে। আজগুবি কার্যকলাপগুলি এই আসরেই মস্তিষ্কমন্থন দ্বারা উদ্বুদ্ধ। এই ধরণের কার্যকলাপ বিদ্যালয়ের পরিবেশেও যদি মাঝে মাঝে করা যায়, তবে হয়তো ছাত্রদের মনে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করা যাবে। পরীক্ষাগারে গিয়ে গতানুগতিক এক্সপেরিমেন্ট না করে, মাসে একবার করে তারা হয়তো এমন কিছু করল, যাকে 'ক্রাফট' বা 'ইনস্টলেশন আর্ট'-এর পর্যায়ে ফেলা যায়। একদিন হয়তো সব

ভগবান সন্ধানী ব্যোমযাত্রী

ছাত্রকে নানারকম চৌকো কাগজের টুকরো দিয়ে বলা হল, এই কাগজগুলো দিয়ে এরোপ্লেন বানাও এবং নিক্ষেপ করে দ্যাখো কোন প্লেনটা সবচেয়ে দূরে পৌঁছোয়। ছাত্ররা পরীক্ষা করবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, সমস্ত নিয়ম মেনে। অর্থাৎ যেখানে কাগজের ধরণ পরীক্ষার বিষয়, সেখানে অন্য সব variableকে অপরিবর্তিত রাখতে হবে। এই ভাবেই কাগজের এরোপ্লেন ওড়ানোর অনাবিল আনন্দের মধ্য দিয়ে তারা aerodynamics এর পাঠও হৃদয়ঙ্গম করে নেবে।

আরও একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। একদিন শিক্ষক এক ঝুড়ি ঘন্টা নিয়ে ক্লাসে এলেন। ঝুড়িতে আছে ঘুঙুরের ছোট্ট ঝুমঝুমি থেকে শুরু করে নানান আকারের ঘন্টা। এমনকি মন্দিরের বিশাল ঘন্টাও । আবার এদিকে পিতলের ঘন্টা, লোহার ঘন্টা, কাঁচের ঘন্টা, পোড়া মাটির ঘন্টা এমনকি প্লাস্টিকেরও ঘন্টা। ছাত্রদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিয়ে, প্রত্যেকটি দলকে দেওয়া হল কয়েকটি ঘন্টা। তাদের বলা হল, কোন ঘন্টার কি রকম শব্দ তা লক্ষ্য করতে। এই ভাবেই তারা শিখল বড় ঘন্টা থেকে গম্ভীর শব্দ নির্গত হয় আর ছোট ঘন্টা থেকে মিহি শব্দ। তারা এটাও বুঝল কাঁসার অপর নাম কেন bell metal. এর পর তারা ঘন্টাগুলোকে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের রডের সঙ্গে ঝুলিয়ে নানা রকম wind chime নির্মাণ করে ক্লাসে ঝুলিয়ে দেয়।

এইধরণের মজার খেলায় মনোরঞ্জন, বিজ্ঞানচর্চা, শিল্পচর্চা - সব মিলে মিশে এক হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক যুক্তি, মৌলিক চিন্তা এবং হাতেকলমে নতুন প্রয়াস, এই তিনের মেলবন্ধনে ছাত্রের চিন্তার উন্মেষ ঘটে। বিজ্ঞান এবং গণিত যদি মনকে সংযমে আবদ্ধ করে, তবে শিল্পচর্চা মনকে বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়। বিজ্ঞানশিক্ষার দ্বারা যদি বুদ্ধি শাণিত হয়, তবে শিল্পশিক্ষা দ্বারা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জাগ্রত হয়।

বিজ্ঞান ও শিল্প পরস্পরের পরিপূরক। একই অঙ্গে দুই রূপ।

উপসংহার

শেষ করার আগে কয়েকটি ইউটিউব ভিডিওর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথম ভিডিওটির নাম "The unexpected maths behind Van Gogh's Starry Night". লিঙ্ক https://youtu.be/PMerSm2ToFY. এই ভিডিওতে দেখানো হয়েছে যে ভ্যান গঘ মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় যে Starry Night ছবিটি এঁকেছিলেন, সেই ছবিতে তারার থেকে নির্গত আলোর নকশা, eddy ev turbulent flowর সমীকরণের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। অর্থাৎ কিনা এই সমীকরণে সংখ্যা বসিয়ে যে বক্ররেখা পাওয়া যাবে, ভ্যান গঘের Starry Nightএ তারা থেকে সেই একই বক্ররেখা নির্গত হচ্ছে। শিল্পী 'ষষ্ঠ' ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা বুঝেছেন, গণিতজ্ঞ অঙ্ক কষে সেই একই অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছেন।

আরেকটি ভিডিওর নাম Donald in Mathemagic Land| Disney Pictures দ্বারা প্রযোজিত এই ছবিতে দেখা যায় ডোনাল্ড ডাক অঙ্কের জগতে প্রবেশ করে পিথাগোরাস প্রভৃতি গণিতজ্ঞের দেখা পেল এবং সঙ্গীতের সুরঝংকার, মোনালিসার অবয়ব, গ্রীসের স্থাপত্য এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে নিহিত গণিতের সন্ধান লাভ করলো। আধঘন্টার টানটান এই ছবি অঙ্কের ক্লাসে আলোড়ন ফেলে দিতে বাধ্য এবং অঙ্কে বিরাগী ছাত্রকে অনুরাগী করে তুলতে সক্ষম। ছবিটির লিংক: https://youtu.be/RU5mTgZuDaE

অবশেষে গণিতের শিক্ষকদের অনুরোধ করবো Fibonacci numbers এর উপর আর্থার বেঞ্জামিনের Ted Talk যেন অবশ্যই শোনেন। লিংক: https://youtu.be/SjSHVDfXHQ4

বিদঘুটে বাদ্যযন্ত্র

শুভা দাশ মল্লিক একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং মিডিয়া স্টাডিসএর অধ্যাপিকা। বর্তমানে বিচিত্র পাঠশালার সচিব।

বিজ্ঞান শেখার আনন্দ

- ডঃ অলকানন্দা ঘোষ

ছোটবেলায় সুনির্মল বসুর একটি কবিতা সবাই আমরা পড়েছি শুধু কবিতা হিসেবে। বড় হয়ে যখন নিজে শিক্ষাজগতের সাথে পেশাগতভাবে যুক্ত হয়েছি তখন অনুধাবন করতে পারছি তার তাৎপর্য। 'সবার আমি ছাত্র' এই বিখ্যাত কবিতাটির প্রত্যেকটা লাইনতো বটেই, তার শেষ ছত্রগুলোতে অসাধারণ কয়েকটা কথা বলে গেছেন কবি।

"বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর
সবার আমি ছাত্র.
নানান ভাবে নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়
পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায়
শিখছি সেসব কৌতুহলে
সন্দেহ নাই মাত্র!"

একজন ছাত্রের কাছ থেকে পাওয়া, তার আনন্দময় লেসনের বিবরণ, পাঠশালা সম্পর্কে এক বিশ্বজনীন শংসা, শিক্ষার এর থেকে বড় লক্ষ্য আর কি ই বা হতে পারে! সবচেয়ে বড় পাঠশালা হল প্রকৃতি। শিক্ষকের কাজ ছাত্রের মধ্যে কৌতুহল জাগিয়ে তোলা। শিক্ষার্থী নিজেই তার ভিতরের জিজ্ঞাসা, উদ্ভাবনী শক্তি ও সৌন্দর্য পিপাসায় শেখার মধ্যে দিয়ে আনন্দ পাবে। তখনই সে একজন আবিষ্কারকের মত প্রথম দেখার, প্রথম অনুভব করার আনন্দ উপলব্ধি করবে। এর ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিষয় সম্পর্কে যে আগ্রহ ও জ্ঞান তৈরি হয় তাকে আমরা cognitive development বলি। এর সাথে সঠিকভাবে পাঠ্য বই, ক্লাসরুম শিক্ষার ব্যালান্স দিতে পারে সেই কাঙ্খিত পরিবেশ, যা আমরা শিক্ষাঙ্গনে তৈরি করতে চাই। দেখা গেছে এইভাবে লব্ধ জ্ঞান স্থায়ী হয় ছাত্রের জীবনে। বিশেষ কোন বিষয়ের শিক্ষা তখন ওই ছোট্ট গণ্ডিটা ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন অঙ্গনে ছড়িয়ে যায় এবং শৈল্পিক হয়।

শিক্ষার সাথে বিগত তিরিশ বছর সংযুক্ত আছি। রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থার বলি হওয়া প্রজন্মের পর প্রজন্ম ছাত্রছাত্রীদের দুরবস্থা দেখে, ছোট ছেলেমেয়ে থেকে আরম্ভ করে যুবসম্প্রদায়ের বই (কঠিন ও পেলব দুই মাধ্যমেই) বিমুখতা দেখে হতাশ হই, বুঝি পড়ার মধ্যে সেই আনন্দটা তাকে দেওয়া যায়নি, যেটা পেলে চাকা গড়গড় করে আপন গতিতেই চলত।

আনন্দের মধ্যে দিয়ে শেখানো এবং শেখা - এই বিষয় নিয়ে NCF ২০০৫ এর নির্দেশিকা খুব পরিষ্কার ছিল। Learning without burden - ছাত্র এবং অভিভাবক থাকবেন পুরোপুরি নির্ভার - দুশ্চিন্তা নয়, আনন্দের মধ্যে দিয়ে একটা প্রক্রিয়া - সমাজ, ইতিহাস, মূল্যবোধ, রোজকার জীবন ও তার সমস্যা - সব কিছুর সমন্বয়ে হবে শিক্ষা। NCERT র তত্ত্বাবধানে CBSE র যে পাঠ্যবই, তার অনুসরণে সব রাজ্যে নতুন করে পাঠ্যবই লেখা হল। আমাদের রাজ্যেও স্কুলে স্কুলে তার ব্যবহার শুরু হল। প্রতিটি 'সাবজেক্টের অ্যাক্টিভিটি' প্রতি পাতায় পাতায়। বই নয়, যেন 'সাবজেক্ট' পড়ানোর একটা 'ম্যানুয়াল'। NEP ২০২০ তেও শিক্ষাদানের খোলনলচে বদলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। 'সাবজেক্টের' বিষয় বস্তু নিজেই তার সীমানা অতিক্রম করবে - Integrated learning, integration of knowledge - জ্ঞান যেথা মুক্ত....

যে অবস্থাতেই কোন ছাত্রছাত্রীকে অঙ্ক বা বিজ্ঞান শেখানোর সময় কখনই আগেই বিষয়বস্তু বলে দেওয়া আমার পছন্দ নয়। তাই এই শিক্ষানীতি প্রণয়নের আগে থেকেই আমাদের স্কুলে চেষ্টা করা হত কোনও নতুন বিষয় পড়ানো শুরু করার আগে কিছু activity যদি করানো যায়, সেই চেষ্টা করা। সেই activity কখনই শুধুমাত্র জিনিসপত্র, কাগজ-কলম নিয়ে নয়।

'ক্লাস ফাইভ'কে দৈর্ঘ্য পরিমাপ শেখানোর আগে সবাইকে দড়ি নিয়ে আসতে বলা হল। সবাই তার নিজের বেঞ্চের মাপ নিল, জিজ্ঞাসা করা হল কত মাপ, এবং কার বেঞ্চের দৈর্ঘ্য বেশি। এটা কারও পক্ষেই সঠিক বলা সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় টীচার যখন প্রশ্ন করছেন যে কিভাবে সঠিক মাপ পাওয়া যাবে, তখন ওদের মধ্যে থেকেই উত্তর বেরিয়ে আসছে যে দৈর্ঘ্য মাপার স্কেলই হল সেই নির্দিষ্ট ব্যবস্থা যার সাহায্যে সেটা করা যাবে। এটা ওরা সবাই এতদিন জানত প্রচলিত নিয়ম বলে, যে ঐ স্কেল দিয়ে দৈর্ঘ্য মাপা যায়, এবার জানল নিজেদের উপলব্ধি দিয়ে। এই জানাটা স্থায়ী হল আনন্দের মধ্যে দিয়ে সবার সাথে একাত্ম হয়ে শেখাটা হল বলে। এই আনন্দটা যে কোন কিছু শেখার জন্যই খুব জরুরী। এমন হল যে তারপর কয়েকদিন ছাত্রীরা নিজেরাই নানা জিনিসের মাপ নিয়ে চার্ট তৈরি করত। তরলের আয়তন মাপক চোঙের ব্যাসার্ধ একই থাকলে যে দৈর্ঘ্যের ওপর আয়তন নির্ভর করে তা শেখা হল। অন্য যে কোন রাশির পরিমাপ, তার একক, বিভিন্ন এককের সাথে তার সম্পর্ক ও পরিবর্তন - এসব বোঝানো পুরনো rote method এর তুলনায় অনেক সহজ হল।

ভগ্নাংশের অঙ্ক শেখানোর সময় সরু সরু কাগজের স্ট্রীপ কেটে আনতে বলা হয়। মাপ এক ফুট। স্ট্রীপটার দুপ্রান্তে লেখা থাকবে ১ আর ২, আরও কয়েকটা একই রকম স্ট্রীপ একটার ঠিক মাঝখান থেকে একটা দাগ কেটে ২ ভাগের প্রত্যেকটাতে লেখা ১/২ করা,

মাঝখান থেকে কাটা হল। তাহলে ১/২ +১/২ = ১ হয়, ওরা দেখল। আর একটা স্ট্রীপে সম দূরত্বে তিনটে দাগ রয়েছে, ১/৩ লেখা আছে, কেটে নেওয়া হল এবং আবার পাশাপাশি রেখে জোড়া লাগানোর পর দেখা যাচ্ছে সেই ১ হচ্ছে। তার মানে ১/৩ + ১/৩ + ১/৩ = ১ এরপর ছাত্রীরা অনেকেই নিজেরা বুদ্ধি করে এক ফুট দৈর্ঘ্য কে ১২ ভাগ করে ১/২ + ৫/১২ = ১১/১২ এটা বলতে পারত ভগ্নাংশের যোগটা না করেও। অঙ্কের ক্লাস যখন এতটা আনন্দের আর স্বতঃস্ফুর্ত হয়, বিশেষ করে ভগ্নাংশের 'লেসন', তখনই বিষয়বস্তু অতিক্রম করে তার সীমা, নতুন করে আবিষ্কারের নেশায় একজন ছাত্র বা ছাত্রীর বিকাশ হয় শৈল্পিক স্তরে, সত্যিটাকে প্রত্যক্ষ করে নিজের চেতনায়।

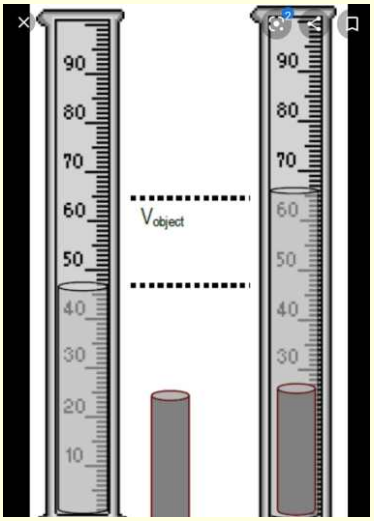

মাপনী চোঙের ব্যাসার্ধ না পাল্টালে তরলের আয়তন তার উচ্চতার সাথে বাড়ে। পঞ্চম শ্রেণীর সঙ্গে দৈর্ঘ্য পরিমাপের ক্লাসে হাতেকলমে।

ক্লাস সিক্সের সিলেবাসে আপেক্ষিক বেগের ধারণা দিতে বলা হল, ছাত্রীদের মনে তা ঢোকাতে বেশ বেগ পেতে হল টীচারদের। আমরা লক্ষ্য করেছিলাম পড়ানো, ছবি দেখানো, গল্প বলার তুলনায়, একটা ছোট্ট নাটকের স্ক্রিপ্টে animation উপস্থাপনা অনেক বেশি গ্রহণ করল ছাত্রছাত্রীরা। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে এই ফর্ম টি IIT Kharagpur এর TLC র আয়োজনে হওয়া একটি workshop GI প্রশংসিত হয়েছিল। (https://drive.google.com/file/d/1LsL7GYPKUJEdIno467E2fB2498IokzU7/view?usp=sharing)

ক্লাস নাইনে পড়ানো হয় আলোর চ্যাপ্টারে পূর্ণ আভ্যন্তরীন প্রতিফলন। আমাদের শহরতলির স্কুলগুলোতে ছাত্রীসংখ্যা প্রচুর।

আলোর আভ্যন্তরীন পূর্ণ প্রতিফলন

কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করে গোল করে বসানো হল তাদের। মাঝখানে রাখা হল হাইবেঞ্চ। পড়ানোর বিষয়ের নাম কিছু না বলে, গ্রুপগুলোর প্রত্যেকটাতে দেওয়া হল বিকার, তাতে সাবানগোলা জল , আর একটা করে লেজার টর্চ। সাবানজলের দ্রবণসহ বিকার টেবিলের ওপর রেখে পাশে নিচের দিক থেকে ফেলা হল আলো,জল আর বায়ুর সংযোগতল থেকে প্রতিসৃত আলোর বায়ুতে বেরিয়ে যাওয়া দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কার, লেজারের উজ্জ্বল লাল আলোর জন্য। এরপর আস্তে আস্তে কোণটাকে পাল্টে দেখা গেল লাল আলো আর বাইরে যাচ্ছে না, জল আর বায়ুর সংযোগস্থল থেকে জলের ভিতরেই আবার প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রতিটা গ্রুপের উত্তেজনার আঁচ টের পাওয়া যাচ্ছিল, 'পূর্ণ আভ্যন্তরীন প্রতিফলন' সেদিন পূর্ণ সাফল্য পেল। নিজেরাই নানা রকম করে আলো ফেলে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলল। এমনকি যে অমনোযোগী মেয়েরা জানালার বাইরে আকাশ খোঁজে, তারাও আগ্রহের সাথে অংশ নিল। কেন সাবানজল, এই প্রশ্নের উত্তর পেতে শুধু জল নিয়ে তার পরীক্ষাও করল তারা। সাবানের কোলয়েড দ্রবণে আলোর বিচ্ছুরণ বা scattering এ-র জন্য লেজারের পথ টা যে পরিষ্কার দেখা যায়, তাও জানা হল । আগে থেকে বিষয়ের নাম ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেওয়া নয়, বিভিন্ন হাতে কলমে পরীক্ষা করে তাদের দিয়েই উপলব্ধি করানো হচ্ছে সেদিন কি পড়া হল। এরকম ভাবেই এখন বিজ্ঞান শেখানো হচ্ছে বেশ কিছু স্কুলে। এ ব্যাপারে আমাদের রাজ্যে Science Communicators' Forum খুব ভাল কাজ করছে।

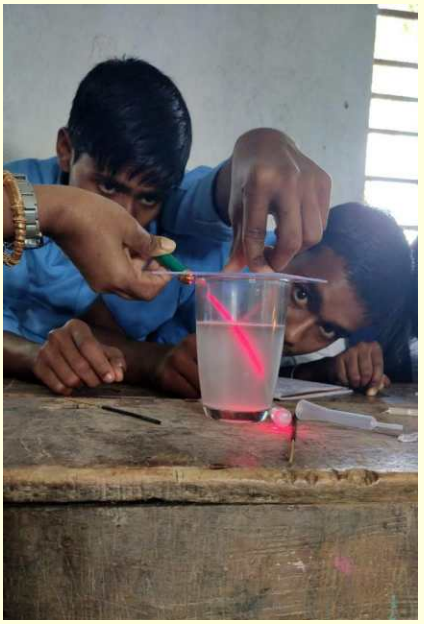

আলোর আভ্যন্তরীন পূর্ণ প্রতিফলনের পরীক্ষা - নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের হাতেকলমে

এভাবে প্রতিনিয়ত ছবি আঁকা, মডেল তৈরি করা, গান, নাচ, নাটকের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর সাথে ছাত্রদের পরিচয় করানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর হল। এই সহজ সত্যিটা আমাদের বুঝতে এবং মানতে অনেক দেরি হলেও, আশার কথা যে কিছু মানুষের নিরলস প্রচেষ্টায়, আমরা না পেলেও আমাদের ছাত্রছাত্রীদের প্রজন্ম যত্ন করে শেখার সুযোগ পাচ্ছে। আসলে চারুকলা মানুষের স্বাভাবিক আনন্দের ক্ষেত্র। সেই আনন্দের মধ্যে দিয়ে সর্বজনীন জ্ঞানের বিচরণ ক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে যে লেখাপড়া, যা শেখা তাতেই তার মুক্তি, পড়াশোনা তার অকারণ স্বাধীনতাহরণ নয় !

রবীন্দ্রনাথের গানে আছে বিশ্বসৃষ্টির রহস্য -

"নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহ পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতির্মঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়।"

প্রলয় বা 'big bang' ই সেই নৃত্য যার ফলে বিশ্বের সৃষ্টি, শুরুর সেই বিপুল শক্তির জ্যোতি থেকেই একে একে গ্রহ, তারা, নক্ষত্রমণ্ডল, সব কিছুর সৃষ্টি। তার আগে বিবশ বিশ্বকে কারোর জানা নেই, তরঙ্গের অভিঘাতে চেতনার উন্মেষ যখন হল, তখনই বিশ্বের জন্ম হল, তাকে জানা শুরু হল।

বিজ্ঞানকে বোঝার দুটো পথ - একটা পথে কিছু বিশেষ ট্রেনিং বা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে গণিতের আলোকে বিষয়কে বোঝা বা তার চেষ্টা করা, আরো অনুসন্ধানের পথ খোঁজা, আর অন্য পথ হল নিজের দর্শন ও চেতনার জগৎকে সমৃদ্ধ করা এবং সেই আলোকে বিজ্ঞান বা সত্যসুন্দরকে জানা। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়েও আমাদের পথপ্রদর্শক হতে পারেন। তার সাথে আইনস্টাইনের দীর্ঘ কথোপকথনে তার গভীর বিজ্ঞানবোধ প্রতিফলিত হয়েছে বারবার, যাকে আইনস্টাইনও শ্রদ্ধা করেছেন এবং মেনে নিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনাও, জটিল অঙ্কের সমীকরণ যেখানে পৌঁছয়, সেখানেই গিয়ে মেশে। বিষয়ের সীমা অতিক্রম করে Art এর সাথে জ্ঞানের এই সমন্বয়, তিনি করে গেছেন বহু আগে। এ বিষয়ে তাঁর লেখা 'বিশ্ব পরিচয়' বইটিও নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

ডঃ অলকানন্দা ঘোষ প্রধান শিক্ষিকা, কামরাবাদ গার্লস হাই স্কুল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা

ঋণস্বীকার :

১. Centre for Innovation and Leadership in special Education, www.kennedykreiger.org/stories/linking ire search

২. বিশ্বপরিচয়।

৩. Tara Julia Hamilton
School of Engineering
Macquarie University
Sydney, Australia
tara.hamilton@mq.edu.au

Vicky Saisanas
Bankstown Girls' High School
NSW Department of Education
Sydney, Australia
vicky.saisanas@det.nsw.edu.au

Micah Goldwater
School of Psychology
University of Sydney
Sydney, Australia
micah.goldwater@sydney.edu.au

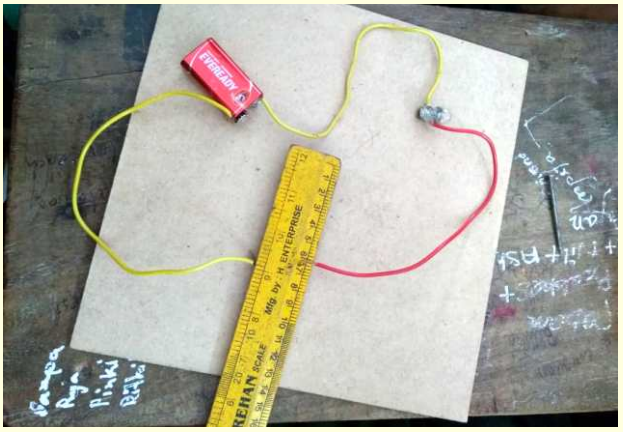

চারপাশের কোন জিনিসগুলো তড়িৎ পরিবাহী, কোনগুলো নয় - সপ্তম শ্রেণীকে নিয়ে তার পরীক্ষা

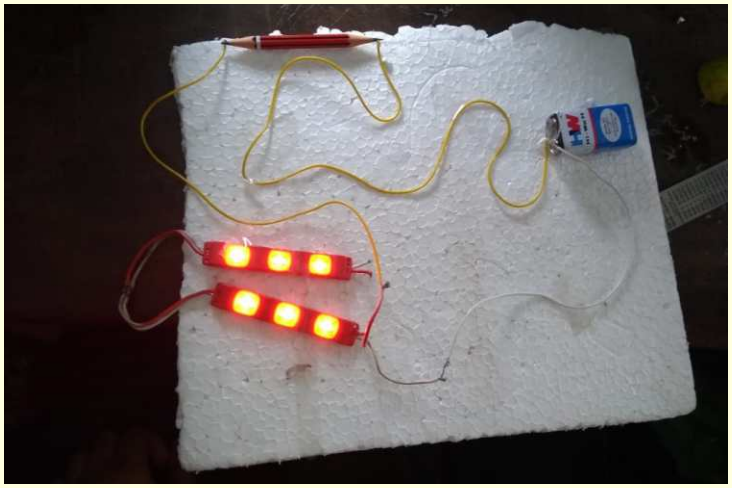

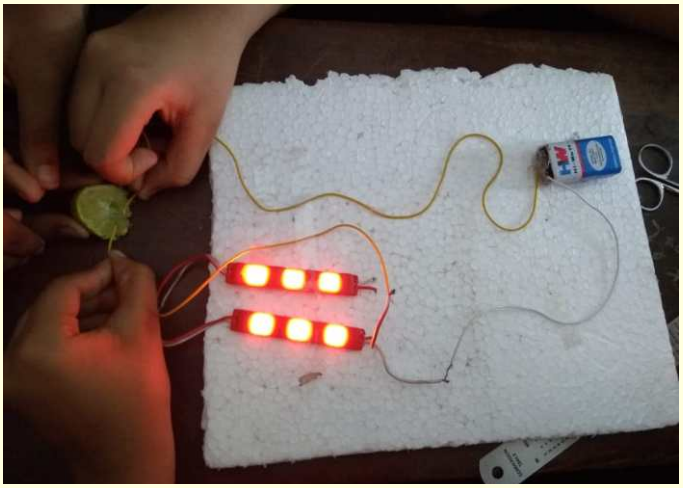

চারুকলা ও শিক্ষার মেলবন্ধন - একটি আলোচনা

- সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় নব্বই বছর আগে লিখে গেছেন যে কেবলমাত্র অক্ষরের ভাষায় সম্পূর্ণ আত্মবিকাশ সম্ভব নয়। রেখা, রঙ বা ছন্দের ভাষারও প্রয়োজন আছে, বরং সেই ভাষার ব্যবহারে মনের সব বন্ধ দরজা খুলে যায়। আমরা নিজেকে আরও নিবিড়ভাবে চিনতে শিখি। কলাবিদ্যা মানুষকে প্রকৃতি অনুরাগী করে। প্রকৃতির মধ্যে যে রূপ, রস, ছন্দ থাকে, তাকে অনুভব করার মধ্যেই সুপ্ত থাকে আত্মবিকাশের বীজ।

এতদিন আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে কলাবিদ্যাকে অন্যান্য বিষয়ের মতন সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ তে কলাবিদ্যা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

কিছু কিছু সংস্থা অবশ্য বেশ কিছুদিন ধরেই শিক্ষাজগতে শিল্পচর্চাকে অন্তর্ভুক্ত করে পরীক্ষামূলকভাবে সফল প্রয়োগ করছেন। এইরকমই একটি সংস্থা থিঙ্কআর্টস (ThinkArts)। তাঁরা বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে ছোটদের মধ্যে শিল্প ভাবনা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। জাতীয় শিক্ষানীতিকে মাথায় রেখে 'থিংকআর্টস' গত নভেম্বর (২০২০) মাসের ৫, ৬ এবং ৭ তারিখে কয়েকটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন। আলোচনাসভার উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দেশে শিল্পচর্চাকে কিভাবে স্কুল পড়ুয়াদের মানসিক বিকাশের অঙ্গ করে তোলা হচ্ছে, তা পর্যালোচনা করা।

আলোচনায় প্রথম বক্তা ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সায়েন্স গ্যালারি ও শিক্ষা বিভাগের প্রধান ব্রিজেট ভ্যান লিউভেন। তিনি বর্তমানে

অস্ট্রেলিয়ার সায়েন্স গ্যালারি

মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের প্রধানও বটে। তাঁর পরিচালিত প্রকল্পগুলিতে সৃজনশীলতা এবং বিজ্ঞানমনস্কতা দুইয়েরই বিকাশ ঘটেছে। আগামী বছর তিনি একটি 'স্টেম' (STEM) শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে চলেছেন। STEM অর্থাৎ বিজ্ঞান (Science), প্রযুক্তি (Technology), ইঞ্জিনিয়ারিং (Engineering) এবং অঙ্কের (Mathematics) হাতে-কলমে কাজের চর্চাকেন্দ্র। তবে এই শিক্ষাকেন্দ্রে শিল্পকলারও (Arts) সমান গুরুত্ব থাকবে। সুতরাং তাঁর মতে সংস্থাটি হবে STEM এর পরিবর্তে STEAM শিক্ষাকেন্দ্র। বিজ্ঞান এবং শিল্প-চিন্তার আদান প্রদানে আগ্রহী আমন্ত্রিত তরুণ-তরুণীরা ভাবনার ও মতের আদান প্রদানের মাধ্যমে একদিন স্থাপন করবে সম্প্রীতি ও সাম্যের পরিবেশ।

বিজ্ঞান এবং শিল্প-চিন্তার আদান প্রদানের জায়গা সায়েন্স গ্যালারি

লিউভেনের মতে স্কুলের পাঠক্রমে শিল্পচর্চা, বিজ্ঞানচর্চার মত মর্যাদা পায় না। অভিভাবকদের ধারণা শিল্পচর্চা ছাত্রের কর্মজীবনে বিশেষ কাজে লাগবে না। অথচ শিল্প মানে তো শুধু ছবি আঁকতে শেখা বা সঙ্গীত চর্চা নয়। শিল্প চর্চা মানে তো সৃজনশীল চিন্তাকে বিকশিত করা। তাই ছোটদের গতানুগতিক চিন্তার বাইরে বেরিয়ে ঝুঁকি নিতে উৎসাহ দিলে তাদের সুপ্ত সৃজনশীলতার পথই সুগম হবে।

বক্তা তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার পরে ছিল মিশর। শিক্ষাবিদ মহম্মদ এলঘাওয়ার মতে মিশরের শিক্ষাব্যবস্থা পাশ্চাত্য দেশের মত উন্নত নয়। এখানে সরকারি স্কুলে একেকটি ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা অন্ততঃ আশি। বেশিরভাগেরই একমাত্র উদ্দেশ্য কোনও মতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। শিল্প বা সংস্কৃতির কোনো গুরুত্বই তাদের কাছে নেই। এই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যই ষোলো বছর আগে এলঘাওয়া একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য একটাই - শিল্পকলাকে শিক্ষার মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা। প্রথমে নাটকের মাধ্যমে ভাষা এবং ইতিহাস, তারপরে বিজ্ঞানের মত বিষয়েও শিল্পকলার ব্যবহার শুরু হয়। জীববিজ্ঞানের ক্লাসে ছবির ব্যবহার, সেই সব ছবির নান্দনিক গুণ নিয়ে কিছু আলোচনা - এভাবেই মেলবন্ধনের কাজ এগিয়ে চলে। এরপর তাঁর মনে হয় - এই শিল্পশিক্ষা 'প্রক্রিয়ানির্ভর' হওয়া উচিৎ নাকি, 'ফলাফল নির্ভর' হওয়া উচিৎ? শিল্পচর্চাতে পারদর্শিতা লাভ করা কি একান্তই প্রয়োজন

নাকি প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই শিল্পীসত্ত্বার বিকাশ ঘটে? নির্দিষ্ট কোনও উত্তর এখনও অজানা।

এলঘাওয়ার পরবর্তী প্রকল্প "Hope for Tomorrow" বা "আগামী দিনের আশা"। এই প্রকল্পে সরকারি স্কুলের পিছিয়ে পড়া ছাত্র আর বেসরকারি স্কুলের এগিয়ে থাকা ছাত্রদের নিয়ে আলোচনা হয়। তিন মাস ধরে তারা নাচ, গান, নাটকের যৌথ পরিবেশনায় নিজেদের ব্যস্ত রাখে। নাটকের পরিচালনা এবং উপস্থাপনাও তাদের। মজার ব্যাপার এই যে এই যৌথ উদ্যোগে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের আর্থ-সামাজিক তারতম্য কোনোভাবেই ছায়াপাত করেনি।

বাচ্চাদের সাথে মহম্মদ এলঘাওয়া

বরং যে ছাত্রদের মধ্যে শুরুতে কিছুটা সংকোচ কাজ করছিলো, সহপাঠীদের অনুপ্রেরণায় তারাও দিব্যি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে। সুতরাং দেখা গেল যৌথ শিল্পচর্চা খুব সহজেই সামাজিক ভেদাভেদ মুছে দিতে পারে। উপরন্তু দলের কিছু ছাত্র পরবর্তী জীবনে অভিনয় এবং প্রযোজনা শিল্পকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়।

এই সংস্থার দ্বিতীয় উদ্যোগটির নাম “লাইটস” বা "আলো"। এটি ছিল মিশরের ১৩ থেকে ১৭ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীদের নিজের গল্প নিয়ে তৈরী এক নাটক প্রযোজনা। মিশরে জনসংখ্যার ৬০% যুবক যুবতী। 'লাইটস' হয়ে ওঠে বয়ঃসন্ধির তরুণ তরুণীদের নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলার এবং শোনার একটি নিরাপদ পরিসর। শেষে এই সব বাস্তব গল্পের টুকরো টুকরো জুড়ে একটি চমৎকার নাটক তৈরি হয়। নাটকটি মিশরের নানা স্থানে, এমনকি প্রান্তিক অঞ্চলেও বিশেষ প্রশংসার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়। নাটকের সাফল্য তরুণ তরুণীর মনে বিপুল আত্মবিশ্বাস এনে দেয়। আর এলঘাওয়ার মনে এই বোধ দৃঢ় হয় যে, সমাজকে পাল্টাতে হলে যুবসমাজকে পাল্টাতে হবে আর এই পাহাড়প্রমাণ প্রচেষ্টায় শিল্পচর্চা একটি বড় হাতিয়ার। তাঁর মতে, শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ ব্যতীত কোনও দেশ উন্নতি করতে পারে না। তিনি প্রথম কাজ শুরু করেছিলেন ২০০৪ সালে। এই ১৬ বছরে তিনি প্রচুর শিক্ষার্থীর জীবনে পরিবর্তন আনতে পেরেছেন। কেউ শিল্পী হয়ে উঠেছে, কেউ তাদের প্রতিভার উপযুক্ত অন্য পথ বেছে নিয়েছে। কেউ ডাক্তার হয়েছে, আবার কেউ আইনজীবী। পেশা যাই হোক না কেন, শিল্প তাদের জীবনদর্শনে এনেছে আমূল পরিবর্তন।

সন্ত্রাসবাদের উৎস হিসাবে অনেকেই ভুলভাবে ইসলাম ধর্মকে চিহ্নিত করেন। এলঘাওয়ার মতে এই উগ্রবাদের জন্যে দায়ী জীবনচর্চায় শিল্প ও সংস্কৃতির ছোঁয়ার অভাব। শৈশব থেকেই চারুকলা চর্চার ফলে শিশুর মনে শান্তি ও সম্প্রীতির বিকাশ ঘটে, সে পরকে আপন করতে শেখে।

অ্যান ক্ল্যাট

আলোচনাসভার তৃতীয় বক্তা ছিলেন জার্মানির অ্যান ক্ল্যাট। তিনি ১৯৮৯ সাল থেকে শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে নৃত্য, দৈহিক অঙ্গভঙ্গি, পুতুল নাচের চর্চা করছেন। অ্যান এর কাজ দেশ বিদেশে সমাদৃত এবং পুরস্কৃত হয়েছে। মৌখিক ভাষার পরিবর্তে যখন সারা শরীর কথা বলে, তখন মানুষ অনেক বেশি বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। সূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশ অনেক বেশি বক্তব্য প্রকাশের ক্ষমতা রাখে। অ্যান এর মতে, ৯৩% কথোপকথন মৌখিক ভাষা ছাড়াই করা সম্ভব।

অ্যান একটি চেয়ার নিয়ে মজার এক খেলা করে আমাদের দেখান। কাঠের চেয়ারকে আমরা নির্জীব আসবাব হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু অ্যান চেয়ারটির উপর ভর করে নানারকম শারীরিক কসরৎ করে দেখিয়ে দিলেন যে একই চেয়ারকে কতরকমভাবে কল্পনা করা যায়। আমাদের চোখের সামনে চেয়ারটা হয়ে উঠলো অ্যান-এর সঙ্গী, যষ্ঠি, ভরসা এবং আশ্রয়। তিনি যেন যেন তাঁর চেয়ারটিতে প্রাণসঞ্চার করলেন।

মঞ্চে অ্যান ক্ল্যাটের প্রযোজনা

এই ধরনের খেলা স্কুলের ছেলে মেয়েরা খেলতে পারলে তাদের শারীরচর্চাও হবে আবার কল্পনা শক্তিরও বিকাশ ঘটবে। এরকম খেলা উপস্থিত বুদ্ধি শাণিত করে এবং শরীরের গতিবিধিতে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনে, যা এই 'ডিজিটাল' যুগে প্রায় লোপ পেতে বসেছে। এছাড়াও অঙ্গ ভঙ্গির ভাবপ্রকাশের মাধ্যমে নানান বাধা অতিক্রম

করে মানুষে মানুষে সহজেই যোগাযোগ সুদৃঢ় করা যায়।

সল্ভিগ কোরাম

আলোচনাসভার চতুর্থ বক্তা ছিলেন নরওয়ের সল্ভিগ কোরাম। তাঁর সরকারি প্রতিষ্ঠানটির নাম "আর্টস ফর ইয়ং অডিয়েন্সেস" (Arts for Young Audiences)। নরওয়ে স্বল্প জনসংখ্যার একটি দেশ। তাঁর উদ্যোগে দেশ জুড়ে একটি কার্যক্রম শুরু হয়, যার নাম "দ্য কালচারাল স্কুলব্যাগ"। সল্ভিগের কাজ শিক্ষার্থী এবং শিল্পীদের মধ্যে যোগাযোগের সেতু তৈরি করা। প্রতি বছর অন্তত ৩০০০ পেশাদার শিল্পী দেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিল্পের নানা বিষয় নিয়ে চর্চা করেন।

ছাত্রীর সাথে সল্ভিগ কোরাম

"দা কালচারাল স্কুলব্যাগ" ২০০১ সালে শুরু হয়েছিল। প্রথমদিকে নরওয়েবাসীরা এতে একেবারেই আগ্রহী ছিলেন না। পরে প্রকল্পের সুফল দেখে অনেকেই এর গুরুত্ব বুঝেছেন। শিশুরা কলা, সাহিত্য, সঙ্গীত, ভিস্যুয়াল আর্ট, ফিল্ম, পারফরম্যান্স আর্ট ইত্যাদি শেখার সুযোগ পেয়েছে। শিশুরা নিজেদের মতামত ও পরামর্শ দিয়ে দেশের সংস্কৃতি মন্ত্রকে চিঠি লিখেছে। এইসব চিঠি থেকে সংগৃহীত করা হয়েছে শিশুদের আর্জি। তারই ফলস্বরূপ নরওয়ের সরকার নিয়েছে কয়েকটি সংকল্প, যেমন:

১. শিল্প ও সংস্কৃতির প্রচার
২. ডিজিটাল শিল্পের বিকাশ
৩. শিক্ষাব্যবস্থাতে শিল্পচর্চাকে স্থান দেওয়া
৪. প্রত্যেক শিশুকে শিল্পজগতের সাথে পরিচিত করানো

সমগ্র দেশ জুড়ে এই প্রোগ্রামটির বিস্তার সত্যই অবাক করার মতো। এ ছাড়াও সল্ভিগ কোরাম আর একটি মজার খেলার কথা জানালেন। খেলাটির নাম স্প্লোচিং (Splotching)। এই খেলায় নানা রঙের পেইন্ট-স্কেচ আঁকা কাগজ ছোটদের দেওয়া হয় এবং বলা হয় তারা এই রঙের আঁকিবুকিগুলিকে তাদের নিজেদের মতন বিস্তার করতে পারে। কেউ আঁকিবুকিগুলিতে অক্ষর যুক্ত করে, কেউ রঙের ছোপ লাগায় আর কেউ আপন খেয়ালে রঙ্গিন তুলি দিয়ে লাইন টানে। তুলির টানের সাথে তাদের কল্পনা ডানা মেলে। Sploching এর মাধ্যমে শিশুরা স্বাধীনভাবে বাঁধন ছাড়া চিন্তা করার সুযোগ পায়।

সম্ভবতঃ বিশ্বের কোনো দেশ নরওয়ের মতো শিল্পকে এতটা গুরুত্ব দেয় না। সল্ভিগ এবং তাঁর সংস্থা আন্তর্জাতিক স্তরে অন্য দেশের শিক্ষক এবং সংগঠকদের সহযোগিতায় আগ্রহী। এই সংস্থা ইতিমধ্যে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, প্যালেস্তাইন এবং ব্রাজিলের সাথে নানা অভিনব শিল্পকেন্দ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা এবং জীবনের মধ্যে কোনও বিভেদ টানেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা দেয়। শিল্পের মাধ্যমেই শিশু এই মহাবিশ্বে তার প্রকৃত পরিচয় খুঁজে পায়। শিল্প ও চারুকলা মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় এবং বাস্তব জগতের প্রতি এক অনবদ্য দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে।

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায় নেশায় শিল্পকলা ও বিজ্ঞান অনুরাগী, পেশায় চলচ্চিত্র সম্পাদক

শিশু অভিনেতাদের সঙ্গে মহম্মদ

শিক্ষাক্ষেত্রে সৃজনশীলতার অন্তর্ভুক্তিকরণ - একটি অভিজ্ঞতা

- ঋতি মুখোপাধ্যায়

"মাছেরা সারাদিন জলে থাকে। জলেই ওদের ঘর। মানুষেরা তো আর মাছেদের মত সবসময় জলে থাকে না। তাই মাছেদের হক নদীর উপর সব থেকে বেশি"- নদীর উপর কাদের অধিকার সবচেয়ে বেশি তা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী আয়েশা বলে উঠল।

পড়াশোনার ক্ষেত্রে সৃজনশীল কাজকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা শিক্ষানীতিতে দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে বলা হলেও তার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো সদর্থক পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি। ২০০৫ সালের রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখায় এই বিষয়ে পুনরায় আলোচনার পর, পাঠ্যপুস্তকের চেহারায় অতিরিক্ত ছবির সংযোজন অথবা নানান 'প্রজেক্ট' এর কাজে ছবি আঁকার বা মডেল তৈরির উপর জোর দেওয়ার মধ্যেই সৃজনশীল কাজ সীমাবদ্ধ হয়ে থেকে গেছে। বেশিরভাগ সময়েই সৃজনশীলতার ক্লাসটি একটি বাড়তি ক্লাস হিসাবে রয়ে গেছে। সমস্ত ক্লাসের শেষে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের গতানুগতিক কিছু আঁকাজোকা করতে নির্দেশ দেওয়া হলেও, তাদের সৃষ্টিশীল সত্ত্বার বিকাশের সুযোগ তৈরি করার উদ্যোগ তেমনভাবে গ্রহণ করা হয়নি। সৃজনশীল কাজ হিসাবে ছবি-আঁকা যতটা গুরুত্ব পেয়েছে; অভিনয়, গান বাজনার মধ্যে দিয়ে শেখার বিষয়টি একেবারেই আলোচনায় আসে নি। ছবি আঁকার ক্লাসগুলোতেও অনুকরণ করতে পারা ছাত্রছাত্রীদের কদর যত বেড়েছে, চিন্তাশীল ছাত্রছাত্রীদের সাথে সৃজনশীল কাজের ব্যবধানও ততটাই বেড়েছে। এই ব্যবধান বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে সৃজনশীল যে কোনো কাজ অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসাবেই থেকে যাচ্ছে, জ্ঞান নির্মাণের ক্ষেত্রে তার কোনো ভূমিকাই থাকছে না বলে সীমিত সংখ্যক শিক্ষক ও অধিকাংশ অভিভাবক মনে করছেন।

২০২০ শিক্ষানীতিতে অভিজ্ঞতার নিরিখে শেখার ক্ষেত্রে সৃজনশীল কাজকে অন্তর্ভুক্ত করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, কীভাবে শ্রেণীকক্ষের সীমিত সময়ের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক গণ্ডির বাইরে এসে সৃজনশীলতার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের একজন সক্রিয় পাঠক বা জ্ঞান নির্মাণকারী হিসাবে গড়ে তোলা যেতে পারে? একটি কাজের নমুনা দিয়ে এখানে প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিক্রমশিলা এডুকেশন রিসোর্স সোসাইটির থানা-সংলগ্ন নবদিশা শিখন সহায়ক কেন্দ্রগুলির ছাত্রছাত্রীদের সাথে একটি 'অ্যাকশন রিসার্চ' প্রজেক্টটি করা হয়। প্রজেক্টির নাম ছিল 'আমাদের নদী' আর উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রছাত্রীদের প্রতিদিনের জীবনের সাথে যুক্ত নদীর সম্পর্কে আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখে গভীর ভাবে জানা, তাকে সম্পদ হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া ও তা সংরক্ষণের কাজে সচেতন নাগরিকের ভূমিকা নেওয়া। প্রজেক্ট এলাকা হিসাবে গার্ডেনরীচ ও নাদিয়ালকে বেছে নেওয়া হয়। কলকাতার পশ্চিমের সীমানা নির্ধারণ করেছে হুগলী নদী, তার তীরেই রয়েছে গার্ডেনরীচ ও নাদিয়াল এলাকা। নবদিশা কেন্দ্রে এই এলাকা থেকে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আসে, যাদের জীবন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনও না কোনও ভাবে নদীর সাথে যুক্ত।

কাজের শুরুতে নদী বলতেই ছাত্রছাত্রীদের মনে কি কি আসে তার একটি মানস-চিত্র তৈরি করতে বলা হয়। তাদের কাছ থেকে বিবিধ উত্তর আসে- সেখানে গাঙ্গেয় ডলফিন, জেটি, ভেসে আসা মৃতদেহ... সমস্তটাই তারা উলেখ করে। এর পরবর্তীতে নদীর সাথে তাদের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে বলা হয় আঁকার মাধ্যমে। ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ছাত্রছাত্রীদের দলে ভাগ করে চারটি বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে তাদের আঁকতে বলা হয়। বিষয় হিসাবে ছিল 'সবার জন্য নদী', 'নদী ও আমরা', 'নদী কেন দুখী হয়', 'নদী ও দূষণ'। এই কাজটি করার সময় নানান বয়সের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আলোচনায় বাস্তুতন্ত্রের সমস্ত স্তরে থাকা জীবজন্তু ও উদ্ভিদের কথা আসে। একই সাথে উঠে আসে অধিকারের প্রশ্ন "নদী কার?"। এছাড়াও নদীর সাথে জড়িত সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়ম, ধর্ম অনুযায়ী নদীর নামের মধ্যে থাকা প্রভেদ, নদীর সাথে জড়িত অর্থনীতি, নদীর গতি-প্রকৃতি কিছুই বাদ যায় না।

আলোচনার শেষে তাদের ছবি আঁকার কাজ শুরু হয়। আঁকা চলাকালীন দলের প্রত্যেকে প্রক্রিয়ায় নানা ভাবে অংশগ্রহণ করে। প্রজেক্টের শেষে যে আঁকাটি তৈরি হয় সেটা যেমন আকর্ষণীয় ছিল তেমনই আকর্ষণীয় ছিল, আঁকা চলাকালীন ছাত্রছাত্রীদের পর্যবেক্ষণ করা। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হওয়া কথোপকথন, তর্ক, সমস্যার সমাধান করা, রঙের নির্বাচন, ছবিতে কোনো একটি বিষয়কে বিশেষ ভাবে ফুটিয়ে তোলা, ছবিটি যত্ন করে শেষ করা সমস্তটার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছিল ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতার নিরিখে জ্ঞান নির্মাণ করার প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল আলোচনায় কোনো ভাবেই নদীতে স্নান করা বা নদীর জলকে

বাড়ির নানা কাজে ব্যবহারের কথা এল না, কারণ নদীর দূষণের সাথে সাথে এই যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে।

প্রথাগত পড়াশোনায় প্রায় ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই ভূগোলে নদীর গতিপথ, জীবনবিজ্ঞানে বাস্তুতন্ত্র ইত্যাদি আলাদা আলাদা ভাবে জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। অভিজ্ঞতার নিরিখে সামগ্রিকভাবে বিষয়বস্তুটিকে দেখে সেই সম্পর্কে জ্ঞান নির্মাণের

কোনও সুযোগ বেশ কম থাকে। তিনদিনের ঘন্টা দুয়েক করে ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের যে ধরনের অভিজ্ঞতা বিনিময় হল তা প্রথাগত ক্লাসরুমে কোন ভাবেই সম্ভব হয় না। কারণ এই কাজটি করার সময় সম্পূর্ণ বাধাহীনভাবে ঠিক বা ভুলের বিষয় চিন্তা না করে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা তারা বলছিল। এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়েই তারা বিষয়ভিত্তিক গন্ডি পার হয়ে আরও গভীরভাবে ভাবনা চিন্তা করছিল। অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু ছাত্রছাত্রী হয়ত ভাল বক্তা নয়, তারা ছবি আঁকার মাধ্যমে নিজের ভাবনা প্রকাশ করতে পারে কারণ ছবির একটা নিজস্ব ভাষা আছে।

এক্ষেত্রে হয়ত উদাহরণ ছবি আঁকা। তবে এই একই কাজ অভিনয় বা গল্প লেখার মাধ্যমেও করানো যেতে পারত। হয়ত সেক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের দিক থেকে নতুন কোনো দৃষ্টিভঙ্গী উঠে আসত...।

শ্রীমতি ঋতি মুখোপাধ্যায়
লেখিকা শিক্ষিকা এবং প্রশিক্ষক। বিক্রমশীলা এডুকেশন রিসোর্স সোসাইটির সঙ্গে দীর্ঘ নয় বছর যুক্ত।
যোগাযোগ riti.vikrmashila@gmail.com

ছাত্রছাত্রীদের সাথে কাজের মাধ্যমে উঠে আসা নদীর বিভিন্ন অবস্থার চিত্র

এক-একটি রূপকথার জন্ম

- বর্ণালী সেনগুপ্ত

"তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না। যা বিশ্বসত্ত্বার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে " - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত শিক্ষার কাঠামো পরিত্যাগ করে সমস্ত অস্তিত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যের মূলনীতিভিত্তিক পাঠক্রম তৈরি করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন প্রকৃতির কাছাকাছি আদর্শ পরিবেশের মধ্যে শিশুরা বড় হয়ে উঠবে। তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থীদের সৃজনমূলক কাজের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনার মূল বিষয় হলো - নান্দনিকতা, মানবিকতা ও আনন্দের সঙ্গে শিক্ষালাভ।

পথ মেলায় ঘরকে পরের সঙ্গে, অতীতকে অনাগতের সঙ্গে। সেই অন্তবিহীন পথ হল নিরন্তর রবি প্রদক্ষিণরত বিশ্বের পথ। এই উদয়াস্তের পথে পূর্ব মেলে পশ্চিমের সঙ্গে, ভারত বিশ্বের সঙ্গে। কিন্তু সেখানেই তো পথের শেষ নয় । সূর্যের অন্তরে আছে যে শুদ্ধ শুভ্র জ্যোতি, তাই যেমন বিচ্ছুরিত হয় রামধনুর বর্ণালীতে, রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্তরতম কেন্দ্রের আভাও তেমনি বিকিরিত হয়েছে তাঁর সাধনায়, স্থান ও কালের অতিক্রান্ত এক মহাবিশ্বে। বিশ্বপ্রসারী পথের পথিক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কোনোদিনই রুটিন বাঁধা জীবন ভালো লাগে নি। স্কুলকে মনে হতো হৃদয়হীন জেলখানা। নিজের জীবনবোধ থেকেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত পরিবেশে ভাবনার নান্দনিকতা, মানবিকতা ও আনন্দের সঙ্গে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের সৃষ্টিশীল ও মানবিক করে গড়ে তোলে।

১৯৭৮ সালের এক বসন্তে যখন শান্তিনিকেতনের গাছপালা রঙে রসে পরিপূর্ণ তখন বাবা-মায়ের সঙ্গে সেখানে বেড়াতে গিয়েছিল ছ'বছরের ছোট্ট একটি মেয়ে। গাছের তলায় আশ্রমিক পঠনপাঠন, এক ঝাঁক রঙিন প্রজাপতির মতো সেখানকার শিশুদের নাচে-গানে মেতে থাকার যাপন, ছবির মতো সুন্দর ভবনগুলি ..... সবমিলিয়ে তাকে অসম্ভব আকর্ষণ করে। তার ফলস্বরূপ ভর্তি পরীক্ষার বেড়াজাল টপকে পরের বছরই সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে তার আশ্রমিক জীবন শুরু করে। নিমজ্জিত হয় আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি -- এর মধ্যে। সেদিনের মেয়েটি আজ নিজেই শিক্ষিকা।

সার্থকতা তো সেখানেই যখন শিক্ষক তাঁর সমস্ত জীবনের শিক্ষাগুলি দিয়ে পরম মমতায় লালন করেন সন্তান-সন্ততিসম শিক্ষার্থীদের।

আমার শিক্ষকতা জীবনের শুরুর থেকে আজ অবধি শান্তিনিকেতন থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাধারা তথা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মন্ত্রগুলিই আমার কাজের মূল স্বরলিপি। প্রথমে জলপাইগুড়ি জেলার (বর্তমান আলিপুরদুয়ার) গ্রামের পাঠশালা থেকে শুরু করে বর্তমানে কলকাতা জেলার ছোট্ট একটি স্কুলের বড়দিমণি হিসেবে দীর্ঘ কুড়ি বছরের পর পরিক্রমার প্রতিটি পরতে তাঁর শিক্ষাচিন্তা তথা শিক্ষা ও শিল্পচেতনার সরণি বেয়ে আমার শিশুরা বড় হয়ে ওঠে।

শিল্প (art) আসলে বহুমুখী বিষয়। ছবি আঁকা, নাচ, গান, অভিনয়, সাহিত্য, মঞ্চসজ্জা, প্রকৃতিপাঠ, নান্দনিকবোধ সমস্তটা মিলিয়ে এক পরিপূর্ণ সচেতন মানুষ গড়ে ওঠে। আমার ছোট্ট একটা স্কুলের চার-দেওয়ালের মধ্যেই শিশুরা আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করে নেয় সুজলা সুফলা এক বিশ্বকে, পাঠ নেয় এক সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার সঙ্কল্পের। আমাদের বিদ্যালয়ে বাস্তবিকই শিল্পচর্চার মধ্যে দিয়ে চার-দেওয়ালের মধ্যেও পাঠক্রম হয়ে ওঠে রঙিন। শিশুরা মেতে ওঠে বই পড়ার আনন্দে বা আনন্দের বইপড়ায়। শিল্পের বিভিন্ন প্রয়োগে শিশুপাঠ্যক্রম শিশুকে তার দিকে আকৃষ্ট করে। শিশুর অন্তরাত্মার সঙ্গে গঠন হয় এক নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক।

একটু উদাহরণ দিয়ে বলা যাক - শিশু প্রথম যখন গুনতে শেখে এবং তারপর সংখ্যার হরফগুলি চিনতে শেখে, তখন তার সঙ্গে যদি আমরা ছবির মেলবন্ধন ঘটিয়ে দিই তবে সংখ্যাগুলি শিশুমনে তার

★ - ১এ আঁক ইঁদুর
মাথায় দাও সিঁদুর

★ 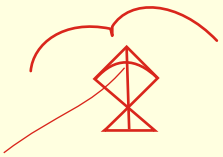 - ২এ আঁক ঘুড়ি
উড়বে আকাশ জুড়ি

★ - ৩এ আঁক হাঁস
জলেতে তার বাস

★ - ৪এ আঁক পিঁপড়ে
দেয় না যেন কামড়ে

পরিচিত একেকটা জীবন্ত চরিত্র হয়ে ধরা পড়ে। সংখ্যা লেখার সঙ্গে আঁকার মাধ্যমে তার locomotor skill developed হয়। শিশুরা সংখ্যাগুলি সুন্দরভাবে লিখতে পারে এবং মনে রাখে । যেমন - এখানে একইসঙ্গে সংখ্যা চেনা, ছবি আঁকার অভ্যাস ও

নান্দনিকবোধ, ছড়ার মাধ্যমে জীব/ বস্তুগুলির ধারণা গঠন ইত্যাদি ... যা শিশুমনে দোলা দেয়.... পাঠকে আনন্দময় করে তোলে, ফলে পাঠ মনের গভীরে প্রবেশ করে। রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠের অনুসরণের রঙ, ছবি, ছন্দের দোলায় শিশু সহজেই অধ্যয়ন করে তার জীবনের প্রথম প্রথাগত পাঠগুলি। তেমনি চতুর্থ শ্রেণির বাংলায় 'তোত্তোচানের গল্প' পড়ার সময় project work হিসেবে যখন ওরা গাছবাড়ির মডেল বানায় তখন পাঠের সঙ্গে ধারণা গঠন ও নান্দনিকতার পরিস্ফুরণ (পরিস্ফুটন) ঘটে। বন্ধু বাৎসল্য, গাছের পরিচর্যা সর্বোপরি আমাদের বিদ্যালয়ের পরিসর অত্যন্ত স্বল্প হওয়ার কারণে ওরা ওই গল্পের অনুকরণে নিজস্ব একেকটি গাছ (চারা) রোপণ করে ফেলে দেওয়া বিভিন্ন পাত্রে / টবে। তার গায়ে সুন্দর করে ছবি এঁকে/ আলপনা দিয়ে পাত্রটিকে সুন্দরতর করে তোলে এবং নিজেদের গাছগুলির যত্ন নেয়, গাছকে ভালোবাসে.... কোনো বন্ধু অনুপস্থিত থাকলে অন্য বন্ধুরা তার গাছটিতেও জল দিয়ে দেয়। এইভাবে গাছগুলি তাদের অন্তরাত্মার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

একইভাবে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ 'আমাজনের জঙ্গলে' / 'দক্ষিণমেরু অভিযান' অথবা তৃতীয় শ্রেণির ইংরাজি পাঠ 'Water' পড়বার সময় চলচ্চিত্র শিল্প মাধ্যমকে ব্যবহার করে তথা পাঠ্যবিষয়কে কেন্দ্র করে তথ্যচিত্র বা ছোট ছোট ফিল্মের মাধ্যমে বিষয়গুলিকে প্রাঞ্জল ও আকর্ষণীয় এবং অবশ্যই তথ্য সমৃদ্ধ করে তোলা যায়। এরফলে শিশুমনে সুদৃঢ় এবং বাস্তববোধ তৈরি হয়।

পঞ্চম শ্রেণিতে শিশুরা আল মাহমুদের কবিতা পড়তে গিয়ে বাংলাদেশকে জানে। জানে তার ভাষা-আন্দোলনের কথা। তথ্যচিত্রের মাধ্যমে ভাষা-শহীদদের প্রতি অবনত হয় তারা.... চোখের কোণে জল চিকচিক করে ওঠে। যা তাদেরকে মাতৃভাষার প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল করে তোলে।

তেমনই বাংলাক্লাসে 'নরহরি দাসের গল্প' বা লীলা মজুমদারের 'আলো' নাট্যটি পরিবেশনের সময় চরিত্রসজ্জা, মঞ্চসজ্জা, background প্রক্ষেপণ ইত্যাদি নান্দনিক কাজের মধ্যে দিয়ে বিষয়ভিত্তিক পাঠের সঙ্গে নান্দনিক সচেতনতা, একতার পাঠ, সহমর্মিতার এক মেলবন্ধন ঘটে যায় শিশুমনে।

আমাদের ছোটবেলায় শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে প্রতি মঙ্গলবার সাহিত্য-সভা হতো। আমার বর্তমান বিদ্যালয়েও শনিবারের সাহিত্য-সভা শিশুদের নান্দনিক সৃজনশীলতাকে সুদৃঢ় করে। এভাবেই দশদিগন্তে জন্ম নেয় রূপকথারা। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ও শিল্পচেতনার আলোয় শিশুরা বড় হয়ে ওঠে। ছোট্ট একটি স্কুলের টবে রাখা গাছের সারিরাই শান্তিনিকেতন রচনা করে।

বর্ণালী সেনগুপ্ত, প্রধানশিক্ষিকা
পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক বর্ণালীর শিক্ষকতাজীবন জলপাইগুড়ি জেলায় শুরু হলেও বর্তমানে তিনি কলকাতার ভোলানাথ হালদার স্মৃতি জি এস এফ পি বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষিকা।

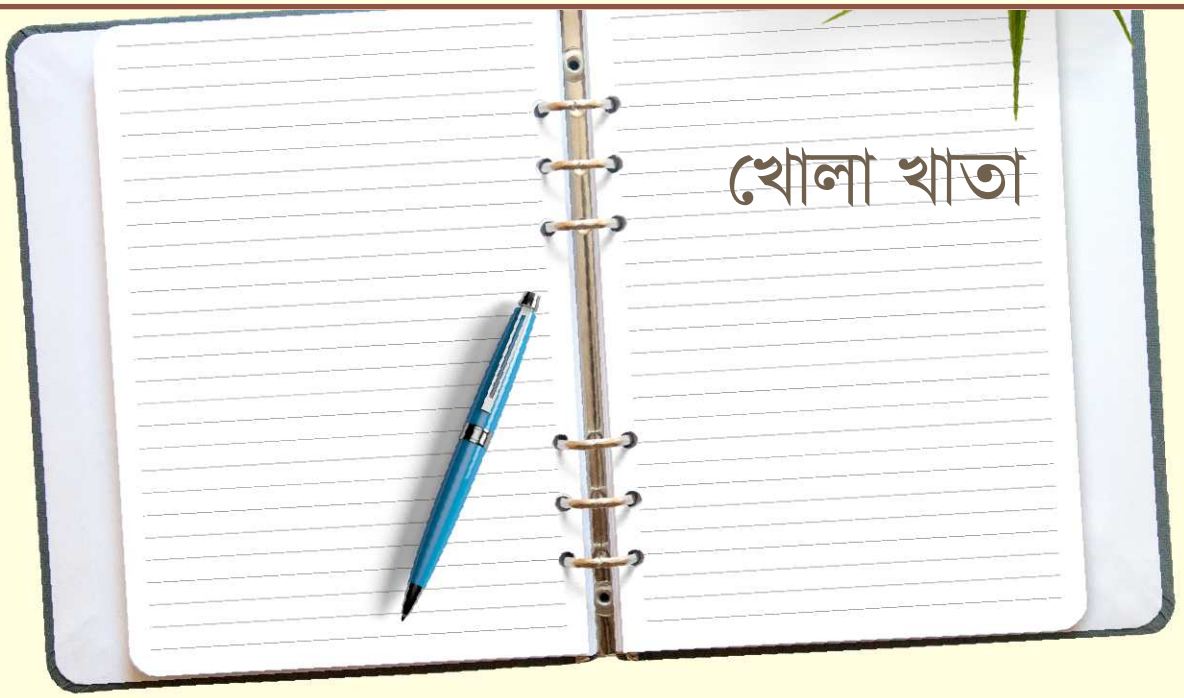

স্মৃতিতে গভীর যন্ত্রণা

আমার কাছে ২০২০ সাল ভীষণভাবে যন্ত্রণাদায়ক একটা বছর। এই ২০২০ সালেই প্রথম দু-মাস নতুন বই-খাতা নিয়ে নতুন ক্লাসে উঠে বন্ধুদের সাথে জমিয়ে আড্ডা দিয়েছিলাম। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই কানে আসছিল একটাই নাম। করোনা ভাইরাস..! প্রাণঘাতী ভাইরাস আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে সব জায়গায় পৃথিবী জুড়ে। বিস্তারিত বুঝতে পারছিলাম না.. করোনা কি? কোভিড কি?

প্রথম প্রথম তো দুটো সদ্যোজাত শিশুর নাম বলেই মনে হয়েছিল। পরে বুঝতে পারলাম ওটা মারাত্মক একটা ভাইরাস। পৃথিবী জুড়ে অনেক লোকের মৃত্যু হচ্ছে। হঠাৎ করে মার্চ মাসের একদিন আমাদের স্কুলও বন্ধ হয়ে গেল। সরকারি নির্দেশে দেশজোড়া লকডাউন...। ব্যস, তারপর থেকে এতগুলো ঘরবন্দি-মাস বাড়িতে বসে বসেই কেটে গেল। এমনকি বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজোতেও বাড়ির চৌকাঠ পার হইনি আমি। আতঙ্ক একটাই, যদি কারও ছোঁয়াতে ভাইরাস আমাকে আক্রমণ করে..!! বাড়িতে বসে থেকে স্কুলটার জন্য ভীষণ মনখারাপ হতে লাগল। প্রথম প্রথম ভাবতাম হয়ত এক সপ্তাহ পরই স্কুল খুলে যাবে, অথবা পরের মাসে লকডাউন উঠে গেলে আবার আমি স্কুলে যেতে পারবো। কিন্তু বাস্তবে তা আর হল না। ভাবতে ভাবতে আর আশা করতে করতেই পুরো বছরটা শেষ হয়ে গেল। বন্ধুদের জন্য যখন খুব মন খারাপ করত, তখন তিন-চার জন মিলে ভিডিও-কল করতাম। তবে আমার মা আমাকে একেবারেই মনখারাপ করতে দেয়নি। সবসময় আমাকে হাসি-মজায় ভরিয়ে রেখেছে। এইজন্যই আমি আমার মা'কে এত ভালোবাসি।

এরই মধ্যে স্কুলের অনলাইন ক্লাস শুরু হয়ে গেল। বেশ ভালোই লাগছিল। মুখোমুখি না হোক, স্ক্রিনে তো অন্ততঃ বন্ধুদের, ম্যাম'দের দেখতে পাচ্ছি।

মন দিয়ে পড়াশোনা করছি। আবার এর মধ্যে রান্না শিখছি, ঘরের কাজও শিখছি। কিন্তু একটা কষ্ট থেকেই গেল। বন্ধুদের সাথে টিফিন ভাগ করে খেতে পারলাম না, আত্মীয়-পরিজনদের বাড়িতেও যেতে পারলাম না। ভালোবাসার বন্ধুর হাতের ছোঁয়া তো পেলামই না। কাউকে বিজয়ার প্রণামও করতে পারলাম না। মনের গভীরে যন্ত্রণা মাথাচাড়া দেয়। তবে একদিন ঠিক জানি ঝড় থেমে যাবে, পৃথিবী শান্ত হবে। আবার সবাই মিলবো নতুন দিনের ভোরে।

আত্রেয়ী দাস
অষ্টম শ্রেণী
বেলতলা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়

বিদ্যালয়ের সাথে নিবিড়তা

ছাত্র ছাত্রীদের জীবনের সাথে বিদ্যালয়ের যে একটা অবিচ্ছেদ্য নিবিড় সম্পর্ক আছে তা এই অতিমারির দৌলতে বিশেষ ভাবে অনুভব করতে পারলাম। লকডাউনের আগে আমরা কোভিড ১৯ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না - তখন বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা জীবন থেকে কত মুক্তি পেতে চেয়েছি। বিদ্যালয়ের দিদিমণিদের শাসন খানিকটা আলগা হোক মনে মনে সবসময় চাইতাম। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বন্ধুরা আরও অনেক বেশি আপন হয়ে উঠতো। সেই আনন্দের অনুভূতি বলে বোঝানো যাবে না। তাই বোধহয় এই দীর্ঘ সাড়ে আটমাস সময়কে এক যুগ বলে মনে হয়েছে। এই প্রথমবার শিক্ষকদিবসে দিদিমণিদের অভাব বোধ করলাম। আমরা এই দিনটিতে খুবই আনন্দ করি সবাই মিলে, শুধু এই বছর তা আর হলো না। দিদিমণিদের পড়াশোনার বাইরেও আন্তরিকতার সাথে স্নেহময় স্পর্শে কাছে টেনে নেওয়া, বন্ধুর মত হয়ে ওঠা — সব স্মৃতিগুলো বুকের ভেতর কেমন টনটন করে ওঠে।

অনলাইন ক্লাসগুলো মন দিয়ে করতে শুরু করলাম। দিদিমণিদের সহযোগিতায় স্কুলে না গিয়েও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য তৈরীও হলাম। শুধুই ঘরে বসে পড়াশুনা করা যাবে এইরকমটা আগে কোনদিনও ভাবিনি।

মনে ভিড় করে আসে অনেক স্মৃতি.... ফাঁকা হলঘর, বারান্দায় নেই ছাত্রীদের ভিড়, টিফিন ভাগ করে নেওয়ার মজাটাও আর নেই। বার্ষিক অনুষ্ঠানে কত মজা করতাম... সেই কথাগুলো মনে পড়লে শুধু ভাবি পরিস্থিতি আবার কবে আগের মত হবে।

মনে প্রাণে চাই পৃথিবী করোনামুক্ত হোক । আমরা আমাদের বন্ধুদের ও দিদিমণিদের সাথে আবার বিদ্যালয়ের পুরোনো স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে চাই।

স্মৃতি সাহা
নবম শ্রেণী, বেলতলা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়

স্মৃতির আদরে আমার চেনা লাল বাড়ি

আজ বড় একা লাগছিল। বার বার মনে পড়ছিল তোমার সাথে কাটানো দিনগুলোর কথা। আমার প্রথম দেখা তোমার সাথে ২রা জানুয়ারি, ২০১৫ সাল। প্রথম তোমায় যখন দেখি, তখন তুমি ছিলে আমার কাছে অচেনা। তারপর ধীরে ধীরে তোমার আমার বন্ধুত্ব শুরু। বৃষ্টিভেজা দিনগুলোতে তুমি আশ্রয় দিতে, গরমের সময় তোমার সাথে বেড়ে ওঠা গাছগুলোতে অমৃত খুঁজে পেতাম আমি। টিফিন খেয়েই সোজা দৌড় লাগাতাম, ওই স্টেজটার কাছে ব্যাডমিন্টন খেলতে ।

মনে পড়ে ১৫ ই এপ্রিল ২০১৫ সালে ভূমিকম্পের কথা। ভূমিকম্পের আমার প্রথম অভিজ্ঞতা..। কম্পিউটার ক্লাসের পরে যখন জুতো পরছিলাম ঠিক তখনই আমার মাথাটা একটু যেন ঘুরে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে ওপর থেকে দিদিরা তড়িঘড়ি নামতে শুরু করে দিল, সঙ্গে তাদের শ্রেণী শিক্ষিকা। তিনি আর দিদিরা মিলে ছাত্রীদের নিচে নামাতে শুরু করেন। আমাদের মতো আরও অনেকেই নিচে মাঠে এসে ভিড় করেছিল। শিক্ষিকারা ছাত্রীদের শান্ত হতে বলছিলেন কারণ কেউ কেউ কান্নাকাটি করছিল। তখন শুধু মাথায় ঘুরছিল যদি সব শেষ হয়ে যায়, তোমাকে যদি না দেখতে পাই, চোখের জল আর ধরে রাখতে পারিনি তোমার জন্য। অশ্রুধারায় বয়ে এসেছিল আমার চোখে। তা অতিক্রম করে আজ পাঁচটা বছর কেটে গেছে।

এখন আমি দশম শ্রেণীর। চুপি চুপি বলি, তবে যখন একা থাকি তোমায় যখন দেখতে পাই না তখনও একইভাবে চোখ ভরে ওঠে জলে। আজ প্রায় দশ মাস তোমায় দেখতে পাই নি। এই মাসগুলোতে বুঝি তুমিও আমাদের জন্য কেঁদেছ, ভেবেছো কবে আমাদের সাথে দেখা হবে..। আমিও ভেবেছি কবে স্কুলে যাব, কবে তোমার সাথে আবার দেখা হবে, কবে জমে থাকা গল্পগুলো আবার তোমায় আর বন্ধুদের বলবো। কবে তোমার শতবর্ষকে ঘিরে আবার হবে নাচ ,গান, আবৃত্তি, নানান বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক। এই কবে'র উত্তর খুঁজে আর পাই না। তবে খুব দেখতে ইচ্ছে করে তোমাকে। তবে একইভাবে তুমি আমায় চিনতে পারবে তো? আমি, আমরা কিন্তু তোমায় ভুলিনি।
আজও আছি তোমার অপেক্ষায়.. আমার প্রিয় লালবাড়ি..।।

অন্বেষা ভাণ্ডারী
দশম শ্রেণী, বেলতলা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়

বেলতলা গার্লস স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ

শ্রেয়সী দাস, নবম শ্রেণি

কথা চক্রবর্তী, অষ্টম শ্রেণি

শ্রদ্ধা সাহা রায়, নবম শ্রেণি

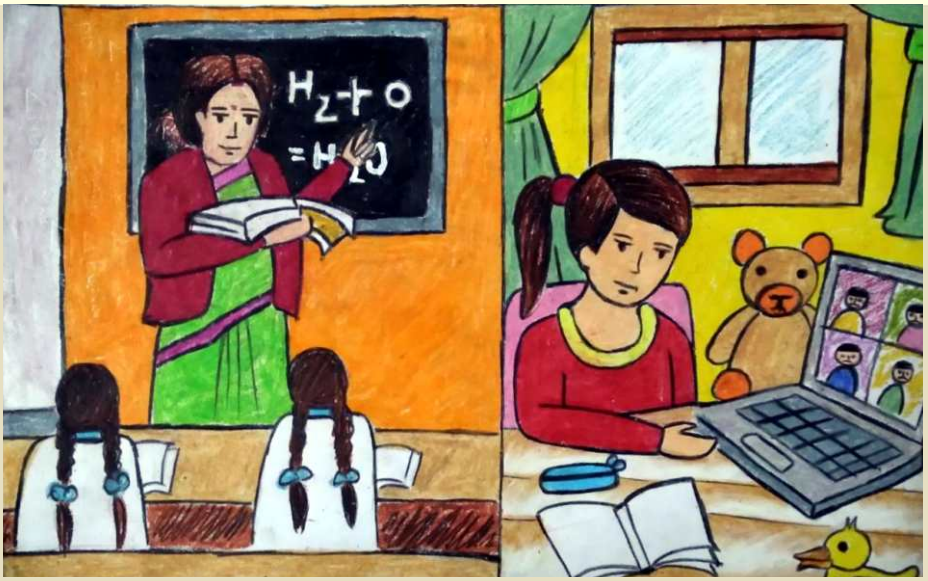

তনুশ্রী সাঁপুই, অষ্টম শ্রেণি

বিচিত্র পাঠশালার কর্মকান্ড

লকডাউনের বিবিধ কর্মকান্ড আট মাসব্যাপী লকডাউনের গ্লানি কাটানোর জন্য, বিচিত্র পাঠশালা বেশ কিছু উদ্ভাবনী কর্মকান্ড ছাত্র এবং শিক্ষক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনা করে। নিয়মিত বার্ষিক কর্মসূচির বাইরে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বিচিত্র পাঠশালার কর্মকান্ডের তালিকা:

- ইস্কুলে বায়োস্কোপ এবং সত্যজিৎ রায় জন্মশতবর্ষ উদযাপন
- অধ্যাপক চান্দক সেনগুপ্ত দ্বারা নিবেদিত বিচিত্র পাঠশালার বার্ষিক বক্তৃতা
- ডঃ দেবীপ্রসাদ দুয়ারীর মনোজ্ঞ আলোচনা:- "সৌর জগতের নতুন রূপ"
- ম্যাজিক অফ মাই স্কুল প্রকল্প
- সিনেমা ইন দা ক্লাসরুম কর্মশালা, ফিল্ম মেকিং কর্মশালা
- ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন পেশার সফলদের নিয়ে একাধিক ওয়েবিনার (মিট দা ইয়ং অ্যাচিভার্স)
- বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় ই-ম্যাগাজিনের প্রকাশ

উপরোক্ত বেশিরভাগ প্রয়াসেই বিচিত্র পাঠশালার প্রভাব দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক আঙিনায় বিস্তার করেছে

শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতির প্রতিযোগিতা

প্রতি বছরের মত এবছরও বিচিত্র পাঠশালার পক্ষ থেকে চলমান ছবিকে শিখনের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতার নাম 'লার্নিং উইথ মুভিং ইমেজেস'। শিখনের এই নয়া পদ্ধতি যে অত্যন্ত কার্যকরী তা তাদের বাৎসরিক কর্মকান্ডে বারবার প্রমাণিত। তবে এই বছর অতিমারির কারণে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি হয় অনলাইনে। প্রাথমিক, উচ্চ-প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক এই তিনটি গ্রুপে শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের পাঠ-পরিকল্পনায় বিভিন্ন চলমান ছবির অংশ ব্যবহার করে দেখান। অনলাইন হবার ফলে এই প্রথম জুরিরা ক্লাসের রেকর্ডিং-এর সাহায্যে ক্লাস চলাকালীন ছাত্রছাত্রীর প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেলেন।

- শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য (সহ সভাপতি, বিচিত্র পাঠশালা)

"লার্ণিং উইথ মুভিং ইমেজেস" প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রাথমিক বিভাগ
প্রথম: জয়ন্তী শ্রীকান্ত, বিড়লা হাই স্কুল
দ্বিতীয় : গৌতম বিশ্বাস ও নবকুমার সাধু , টেকনো ইন্ডিয়া স্কুল, আরিয়াদহ
তৃতীয় : চান্দ্রেয়ী সেনগুপ্ত এবং রোসেলিন গোমস, বিড়লা হাই স্কুল

বিশেষ জুরি পুরস্কার: সায়ন্তনী ঘোষ, অশোক হল গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ।

উচ্চ-প্রাথমিক বিভাগ
প্রথম : দেবলীনা বসু, মহাদেবী বিড়লা ওয়ার্ল্ড একাডেমি
দ্বিতীয় : সুজনা ঘোষ, মহাদেবী বিড়লা ওয়ার্ল্ড একাডেমি
তৃতীয় : অনীষা কর চৌধুরী, মহাদেবী বিড়লা শিশু বিহার

বিশেষ জুরি পুরস্কার: সেলিওনি সেনগুপ্ত, ইন্দাস ভ্যালি ওয়ার্ল্ড স্কুল
নিকিতা সিংহ, অশোক হল গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল

মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিভাগ
প্রথম : শিঞ্জিনী দেব, মহাদেবী বিড়লা শিশু বিহার
দ্বিতীয় : চন্দ্রাণী মুখার্জী, মহাদেবী বিড়লা শিশু বিহার
তৃতীয় : অর্পিতা গোস্বামী, অশোক হল গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল

বিশেষ জুরি পুরস্কার: ঋতুপর্ণা মিত্র, মহাদেবী বিড়লা শিশু বিহার

বিচিত্র পাঠশালার নির্বাচিত বিশেষ পুরস্কার
রিঙ্কু দাস, গার্ডেনরিচ জিএনবিডি গার্লস স্কুল

গ্রহণ ধাওয়া করে

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখার সৌভাগ্য সকলের হয় না। পৃথিবীর কোনও এক নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকতে হয় সৌরমন্ডলের এই নাটকীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য। ১৪ই ডিসেম্বর ২০২০তে যারা দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনাতে বা দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন এই বিরল দৃশ্য। পৃথিবীর অপর প্রান্তে কলকাতায় বসে কিছু বিজ্ঞানপ্রেমী এই মহাজাগতিক বিষয়ের আলোচনায় মেতেছিলেন, যার বিষয় ছিল - "Chasing the Total Solar Eclipse" ।

প্রথমে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডক্টর পার্থ ঘোষ। তিনি পূর্ববর্তী দুটি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের স্মৃতিচারণ করেন। প্রথমটি হয়েছিল ১৯৮০ সালে। গ্রহণের সময়ে পথঘাট জনমানবশূন্য হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজে তখন দূরদর্শনের স্টুডিওতে গ্রহণ নিয়ে একটি আলোচনা সঞ্চালনা করছিলেন।

কিন্তু ১৯৯৫ সালের গ্রহণের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সূর্যগ্রহণ সরাসরি দূরদর্শনে সম্প্রসারিত হয়েছিল। ডক্টর ঘোষ বলেন যে, পূর্ণগ্রহণের পূর্ব মুহূর্তে আকাশে 'হীরের আংটি'র ছটা প্রত্যক্ষ করা এক স্বর্গীয় অনুভূতি ছিল। বইয়ের বর্ণনায় বা ছবি দেখে এই দৃশ্যের মহিমা অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না। চাঁদের ছায়া ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে সূর্যদেব যখন আবার নির্গত হলেন,তখন চারদিকে লোকে লোকারণ্য। কুসংস্কার তাদের গৃহবন্দী করে রাখতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে তিনি বলে উঠলেন, "বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও। বন্দী প্রাণ মন হোক উধাও।"

গত ১৪ই ডিসেম্বরের আলোচনায় প্রধান বক্তা ছিলেন নাসার সৌরবিজ্ঞানী ডক্টর মধুলিকা গুহঠাকুরতা। তিনি তাঁর শুরু করেন সৌরকলঙ্কের ছবি দেখিয়ে। তাঁর মতে সূর্য মোটেই সাধারণ নক্ষত্র নয়, প্রবল এবং পরিবর্তনশীল চৌম্বকক্ষেত্র সূর্যকে সদা সক্রিয় রাখে। ডক্টর গুহঠাকুরতা বিভিন্ন ধরণের রশ্মিতে তোলা সূর্যের ছবি দেখিয়ে 'করোনা' সম্পর্কেও আলোকপাত করেন। তাঁর মতে একমাত্র পূর্ণগ্রহণের সময়েই দৃশ্যমান আলোতে এই 'করোনা'র ছবি তোলা যায়, যার বিস্তার সূর্যের পৃষ্ঠতল থেকে বহু লক্ষ মাইল দূর পর্যন্ত।

২০১৭র পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণের সময়ে গবেষণায় নাসার বিজ্ঞানীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডক্টর গুহঠাকুরতা। ওই সময়ে নাসার তোলা বহু দুষ্প্রাপ্য ছবি দেখিয়ে তিনি দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। তাঁর মতে, জীবনে অন্ততঃ একবার প্রত্যেকের পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ প্রত্যক্ষ করা উচিত।

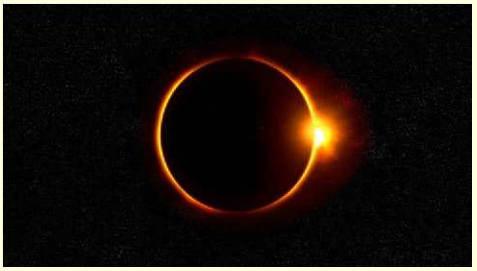

- সুদেষ্ণা চক্রবর্তী